উপন্যাস

ঘুণপোকা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

১. সেইন্ট অ্যান্ড মিলারের চাকরিটা

সেইন্ট অ্যান্ড মিলারের চাকরিটা জুন মাসে ছেড়ে দিল শ্যাম।

চাকরি ছাড়ার কারণটা তেমন গুরুতর কিছু ছিল না। তার ড্রইংয়ে একটা ভুল থাকায় উপরওয়ালা হরি মজুমদার জনান্তিকে বলেছিলেন, বাস্টার্ড। মজুমদার শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে গালাগাল দেয়। তা ছাড়া এতকাল শ্যাম হরি মজুমদারের অনেক হাবভাব, কথাবার্তা নকল করে আসছিল। মাঝে মাঝে বেয়ারা এবং দু-একজন শিক্ষানবিশ ড্রাফটসম্যানকে সে মজুমদারের মার্কামারা গালাগালগুলো একই ভঙ্গিতে এবং সুরে উপহার দিয়েছে। এবং এমনকী তার এ রকম বিশ্বাস এসে যাচ্ছিল যে, পুরনো এইসব গালাগালগুলো বহু ব্যবহারে শক্তিহীন হয়ে গেছে, এগুলোর আর তেমন জোর বা তেজ নেই। আরও কিছু নতুন রকমের গালাগাল আবিষ্কৃত না হলে আর চলছে না।

তবু মজুমদারের কথাটা কানে এলে দু-এক দিন একটু ভাবল শ্যাম। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে ‘টাই’-এর ‘নট’ নিয়ে নাড়াচাড়া করল, বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখের দিকে অর্থহীনভাবে চেয়ে রইল, আচ্ছা না মেরে ঘরে শুয়ে রইল সন্ধেবেলায়। মন-খারাপ তবু ছাড়ল না তাকে। সে নিজেকে বোঝাল যে গালাগালটা আসলে কিছুই না। মজুমদার শব্দের অর্থ ভেবে গাল দেয় না, সে শুধু ওইসব শব্দ উচ্চারণ করে রাগ প্রকাশ করে মাত্র। শ্যাম নিজেও তো কতবার কতজনকে ও রকম গাল দিয়েছে; যা নিজেই সে লোককে দিয়েছে তা ফিরে পেতে আপত্তি হবে কেন? আর, এচাকরি কিছু দিনের মধ্যেই সোনার ডিম পাড়বে। ইতিমধ্যেই সে বাজার ঘুরে ফ্রিজিডেয়ার, রেডিয়োগ্রাম এবং পুরনো ছোট্ট মোটরগাড়ির দাম জানবার চেষ্টা করেছে, বড়লোকদের নিরিবিলি পাড়ায় দুই বা তিন ঘরের ছিমছাম একটা ফ্ল্যাটের সন্ধানেও ছিল সে। তবু বড় অসহায় বোধ করল শ্যাম। চাকরি ছাড়ার কথা সে ভাবতেও পারে না, কারণ এতদিনে এ-চাকরি তাকে উচ্চাশাসম্পন্ন করে তুলেছে।

তবু আস্তে আস্তে শ্যামের ক্লান্তি বেড়ে চলল। শিস্ দিয়ে রাস্তায় হাঁটা, রবিবারে শ্যাম্পু, ছুটির দুপুরে ঘুম–এসবের ভেতর আর তেমন আনন্দ নেই। মাঝে মাঝে যে-সব বড় রেস্তরাঁ বা বার-এ সে সময় কাটাত সেসব জায়গায় যেতেও তার অনিচ্ছা দেখা দিল। অবসর সময়ে ভয়ংকর অবসাদ আর মাথাধরা নিয়ে সে ঘরেই শুয়ে থাকতে লাগল। রাতেও ভাল ঘুম হয় না। দুদিন সে মাঝরাতে উঠে স্নান করল, তারপর সিগারেটের পর সিগারেট জেলে সারাটা শেষরাত ঘরময় পায়চারি করে বেড়াল। সে খুব ভাবপ্রবণ ছিল না কোনও দিন, গভীর চিন্তাও তার অপছন্দ ছিল, হুল্লোড় ছাড়া বাঁচা যায় না এমন বিশ্বাসই সে এতকাল পুষে এসেছে। কিন্তু ক্রমে বুঝতে পারল একটি গালাগাল থেকে একটি ভূত বেরিয়ে এসে তার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর- একটা বদ-অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল তার–কেবলই সে আয়নায় মুখ দেখে। দাড়ি কামানোর ছোট্ট হাত-আয়নাটা সে প্রায় সারাক্ষণ কাছে রাখে। বার বার মুখ দেখে। একদিন সে সবিস্ময়ে আয়নায় লক্ষ করল যে, তার ঠোঁট নড়ছে। সে উৎকর্ণ হয়ে শুনল যে, সে বে-খেয়ালে আপনমনে উচ্চারণ করে চলেছে, বাস্টার্ড। বাস্টার্ড। খুব ভয় পেয়ে গেল শ্যাম, পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো!

অবশেষে জুন মাসের এক ভয়ংকর গ্রীষ্মের মাঝরাতে উঠে টেবিলল্যাম্প জ্বেলে সে তার ইস্তফাপত্রটি লিখে ফেলল। আর-একটা চিঠি লিখল মাকে... আমার চাকরি গিয়াছে। আমার উপর আর খুব ভরসা করিও না। অন্তত আরও দু-তিন মাস তোমাদের কষ্ট করিয়া চালাইতে হইবে... ইত্যাদি। চিঠি লিখবার পর সেই রাতে তার গভীর ঘুম হল।

শৌখিন জিনিসপত্রের মধ্যে তার ঘরে ছিল ভাড়া করা একটা ওয়ার্ডরোব আর একটা বুক-কেস। রূপশ্রী ফার্নিচার্স থেকে নোক এসে একদিন ঠেলাগাড়িতে তুলে সেগুলো নিয়ে গেল। মেঝের ওপর তূপাকৃতি বই, ওয়ার্ডরোব আর বুক-কেসের দুটো চৌকো দাগ থেকে চোখ তুলে ঘরটাকে বেশ বড় বলে মনে হল তার। অনেক সুস্থ বোধ করল সে। ভারমুক্ত। হিসেব করে দেখল ফার্ম থেকে সে প্রভিডেন্ট ফান্ডের যে টাকা পাবে তাতে ঘরটা আরও কিছু দিন রাখা যাবে। দক্ষিণ-খোলা সুন্দর ঘরটি তার, সঙ্গে মান- ঘর।

সুতির জামাকাপড় পরা অনেক দিন হয় ছেড়ে দিয়েছিল শ্যাম। তার বেশির ভাগই টেরিলিন, ট্রপিকাল বা সিল্কের শার্ট-প্যান্ট। বিদেশি টাইও ছিল কয়েকটা। ট্রাঙ্ক আর সুটকেস খুলে সেগুলোর দিকে কৌতুকের চোখে চেয়ে দেখল সে। এখন আর এসব পরার মানে হয় না। খুঁজেপেতে সে ট্রাঙ্কের তলা থেকে পুরনো কয়েকটা সুতির শার্টপ্যান্ট বের করল। প্যান্টের ঘের আঠারো ইঞ্চি, শার্টের কলার অনাধুনিক। সেগুলো পরে নিজেকে বেঢপ মনে হচ্ছিল তার। হাসি চেপে সে সেই পোশাকে চাকরি খুঁজতে বেরোল।

চাকরি? হ্যাঁ, হতে পারে। তার মতো অভিজ্ঞ, অথচ তরুণ লোকের চাকরি আটকাবে না। তবে, একটু দেরি হবে। আর হ্যাঁ, সে হরি মজুমদারের ফার্ম ছাড়ল কেন? কোনও গোলমাল হয়েছিল? কী ধরনের গোলমাল! অত বড় ইঞ্জিনিয়ার, শেল ডিজাইনে যার জুড়ি নেই! তা ছাড়া দেশি ফার্ম দেশের অহংকার! অমন লোকটাকে ছাড়ল কেন সে?

ক্রমে শ্যাম বুঝল এইসব ফার্মগুলোতে নালী ঘায়ের মতো মজুমদারের খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে। মাস তিনেক পর আবার সামান্য ক্লান্তি ও মাথাধরা পেয়ে বসল তাকে। একদিন ভিড়ের এক চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে বিকেলের মরা আলোর দিকে চেয়ে সে বিড়বিড় করে বলল, আমি শেষ হয়ে গেছি। পরমুহূর্তেই চমকে উঠে সে দ্রুত এলোপাথাড়ি হাঁটতে লাগল।

আর-একদিন সে হাত-আয়নাটা মুখের সামনে ধরে জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে ডান হাতের চকচকে একটা সুন্দর ব্লেড কণ্ঠনালীর ওপর রাখল। সামান্য একটু চাপ দিল। বড় আরাম! কিছুক্ষণ পর সরু রক্তের কয়েকটা রেখা তার গেঞ্জির ওপর নেমে বুক ভাসিয়ে দিল। ব্লেডটা ছুড়ে ফেলে সে হেসে আপনমনে বলল, ধ্যৎ, বড্ড নাটুকে। তারপর তোয়ালে দিয়ে গলা মুছে ডেটল লাগাল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, রাস্তায় জীবন্ত মানুষজন চলাফেরা করছে। ক্ষতের ওপর ভেজা তুলো চেপে সে চোখ বুজল। আঃ! বড় আরাম।

তার দুটি শৌখিনতা ছিল। টেলিফোন করা, আর সকালে রোজ দাড়ি কামান। অফিসে তার টেবিলে যখন নিজস্ব টেলিফোন থাকত তখন সে একটু অবসর পেলেই প্রায় অকারণে

একে-ওকে-তাকে ফোন করত। কতজনকে যে সে তার ফোনের নম্বর দিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। টেলিফোনে লোকের গলা শুতে, আর টেলিফোনের জন্যই তৈরি করা কৃত্রিম গলায় কথা বলতে তার ভাল লাগত। চাকরি যাওয়ার ছ' মাসের মধ্যে সে টেলিফোন করল মাত্র দুটি। প্রথমটা করল কলেজ স্ট্রিট ওয়াই এম সি এ থেকে তার অফিসে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা কবে পাওয়া যাবে তা জানতে। দ্বিতীয়টা করল শিয়ালদার স্বয়ংক্রিয় বুথ থেকে ইতুকে, যার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় দক্ষিণ কলকাতার এক রেস্তরাঁয়, এবং যাকে কয়েকবারই সে তার শোওয়ার ঘরে নিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের মেলামেশাটা, যা ঠিক প্রেম নয়, তা বিয়েতে একটা রফায় পৌঁছুতে পারত। তাদের এ রকম কথাবার্তা হল।

শ্যাম, ইতু! কেমন আছ?

ইতু, ভাল না। তোমার দেখা নেই দু' মাস!

আমার খোঁজ করেছিলে?

হ্যাঁ, অফিসে প্রায় মাস দুই আগে টেলিফোন করেছিলুম।

ওরা কী বলল?

বলল, তোমাকে...তোমাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে।

শ্যাম একটু ভেবে বলল, কথাটা ঠিক নয়। আমিই ছেড়ে দিয়েছি।

কেন?

হি কল্ড মি নেন।

হুঁ।

দি বস, দি বাস্টার্ড।

ইতু একটু চুপ থেকে বলল, এত দিন কী করছিলে? চাকরির খোঁজ!

হুঁ।

কিছু পেলে? বেটার কিছু?

ন্‌ন্‌ন্নাঃ।

এখন কী করবে?

শ্যাম মৃদু হাসল, ভাবছি বিয়ে করলে কেমন হয়। ইটস্‌ হাই টাইম।

বেশ তো! কাকে?

তুমি রাজি আছ?

হুঁউ। এক্ষুনি। বলতে বলতে ইতুর গলায় খুব আবেগ এসে গেল, মহীয়সী মহিলার মতো শোনাল তার গলা, শ্যাম, আমিও ছোটখাটো একটা চাকরি করি, তা ছাড়া আমার কিছু গয়না আছে। আমাদের দু'জনের...

শুনতে শুনতে শ্যাম খুব ধীরে ধীরে কান থেকে ফোনটা নামিয়ে আনল, তারপর ঘুমন্ত বাচ্চাকে মা যেভাবে শোওয়ায় সেইরকম সন্তর্পণে ক্যাডেলে রেখে দিল ফোনটা।

আজকাল প্রায়ই শ্যামের মুখে দাড়ি বেড়ে যায়। সেই চাপা চিবুক, গভীর খাঁজওয়ালা সুন্দর থুতনি, ঝকঝকে মুখে সামান্য নিষ্ঠুরতা—যা তাকে আকর্ষণীয় করে তুলত, তা মাত্র কয়েক দিনের নাকামানো দাড়ির তলায় চাপা পড়ে যায়। বড় নিরীহ ও অসহায় দেখায় তাকে। কার্যকারণসূত্র জানে না শ্যাম, তবু তার মনে হয় দাড়ি কামানো না থাকলে চোখ দুটোকেও কেমন যেন একটু ঘোলাটে আর অনুজ্জ্বল দেখায়।

সময় কাটে না বলে শ্যাম মাঝে মাঝে বাসে উঠে টার্মিনাস থেকে টার্মিনাস পর্যন্ত ঘুরে আসে। সুন্দর সময় কেটে যায়। একদিন বালিগঞ্জ থেকে শ্যামবাজারের বাসে উঠেছিল শ্যাম। ভবানীপুরে বাস বিকল হল। বিরক্ত না হয়ে শ্যাম ধীরে সুস্থে নেমে পড়ল। ঘড়িতে সময় দেখল, আড়াইটে। সামনেই একটা ফাঁকা সিনেমা হল। ছবির নামটাও পড়ল না শ্যাম, বাইরের আঁকা ছবিগুলোর দিকে ফিরেও তাকাল না, টিকিট কেটে ঢুকে পড়ল। নিশ্চিত ফ্লপ ছবি, লোকে দেখছে না। আধো অন্ধকার হলের ভিতরে পা দিতেই একটি টর্চের আলো আর একটা ভুতুড়ে হাত এগিয়ে আসে। নিশ্চিন্ত মনে টিকিটটা লোকটার হাতে গুঁজে দেয় শ্যাম, তারপর তার পিছু পিছু চলতে থাকে। সিট দেখিয়ে লোকটা ফিরে যাচ্ছিল, শ্যাম ডাকল, মানুমামা না? টর্চ হাতে লোকটা চমকে ফিরে তাকাল, আরে! শ্যাম! এই সিনেমা হলেই যে মানুমামা কাজ করে তা শ্যাম বার বারই ভুলে যায়। মনে পড়ে, বেশ কিছুদিন আগে সে বৃন্দা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে এখানে ছবি দেখতে এসেছিল একদিন, মানুমামার কথা তার খেয়াল ছিল না। সেদিনও মানুমামা সিট দেখিয়ে দিয়েছিল। বুদ্ধিমান মানুমামা সেদিন তাকে চিনবার বা তার সঙ্গে কথা বলবার কোনও চেষ্টা করেনি। তবু সারাক্ষণ ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিল শ্যাম। বিরক্ত হয়ে ভেবেছিল আর কোনওদিন এই হলে আসবে না। কিন্তু এখন এবার সে আধো অন্ধকারে টর্চ-হাতে মানুমামার দিকে সহজ চোখে তাকিয়ে হেসে বলল, কেমন আছ মামু? তারপর কী ভেবে হঠাৎ অনভ্যাসজনিত দ্বিধা ত্যাগ করে নিচু হয়ে মানুমামাকে প্রণাম করল। অন্তত বিশজন লোক এই দৃশ্য দেখল। খুশি হয়ে মানুমামা বলল, তোকে চেনাই যায় না, রোগা হয়ে গেছিস, গালে একগাল দাড়ি, কী হয়েছে? অমায়িক একটু হাসল শ্যাম, তারপর অবলীলায় বলল, গারদ থেকে বেরোলুম। মানুমামা চমকে ওঠে, কী গারদ? শ্যাম আস্তে করে বলে, পাগলা। মানুমামা একটু ইতস্তত করে, চাকরিটা? শ্যাম বলে, গেছে। মানুমামা দরজার দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল, তুই বোস। আমি পরে এসে কথা বলে যাব। শ্যাম বসল, এবং আপনমনে হাসল। মিথ্যেটুকুর জন্য সামান্য ঘেন্না হচ্ছিল তার, তবু কে জানে হয়তো মানুমামা খুশিই হল। আত্মীয়স্বজনদের সে বরাবর এড়িয়ে চলে, তারাও তাকে ঘটায় না। তার কোনও অমঙ্গল ঘটলে এরা কেউ কেউ খুশি হতে পারে। ইন্টারভালের

পর হল অন্ধকার হয়ে গেল, সে একসময়ে চমকে উঠে টের পেল তার ডান হাতে কে যেন একটা ভরতি ঠোঙা গুঁজে দিচ্ছে। চেয়ে দেখল মানুমামা, বাদাম-চানাচুরের ঠোঙাটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে সিটের পাশেই প্যাসেজে উবু হয়ে বসে হাসছে। সে তাকাতেই বলল, আমার বড় ছেলে বিশুটাকে একদিন তোর কাছে পাঠাব। ওর সঙ্গে আমাদের বাসায় চলে আসবি। আমাদের গড়িয়ায় মস্ত বড় এক তান্ত্রিক আছে, সব অসুখ সারিয়ে দেন, তোকে দেখিয়ে দেব। শ্যাম মৃদু হেসে বলল, দেখা যাবে। মানুমামা ভূতের মতোই হলের অন্ধকারে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল। শ্যাম গালের দাড়িতে হাত বোলায়। তার জামাকাপড় নোংরা, চোখ ঘোলাটে। কে জানে হয়তো তার দুর্দশা দেখে মানুমামা খুশি হয়নি। কাজেই মানুমামার ভুলটা ভেঙে দেওয়া দরকার মনে করে সে হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে অন্ধকারে আন্দাজে 'মামুউ' বলে ডাক দিল। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে তার কাঁধের ওপর একখানা ভারী হাত এসে পড়ল, আস্তে, দাদা! সামান্য হাসির শব্দ। ক্ষীণ অস্পষ্ট একটা গলাও শোনা গেল, মামাকে পরে খুঁজবেন, এখন ছবি দেখুন। শ্যাম আস্তে করে বলল, শালা! তারপর চুপ করে অর্থহীন চোখে ছবি দেখতে লাগল। ভেবে দেখল, এখন মামুর ভুল ভাঙতে গেলে আরও গোলমাল হয়ে যাবে। আরও ভেবে দেখল যে, কয়েকদিনের মধ্যেই তার অনেক আত্মীয়স্বজন জেনে যাবে যে, সে পাগল হয়ে গেছে বা গিয়েছিল। অন্ধকারে আপনমনে নিঃশব্দে হাসল শ্যাম, তারপর সিটের পিছনে মাথা হেলিয়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

.

চাকরি যাওয়ার পর থেকে যে পাইস হোটেলে দু'বেলা খাচ্ছিল শ্যাম, সেখানে সুবোধ মিত্রের সঙ্গে আলাপ। একদিন রাতে মুখোমুখি খেতে বসে মিত্র বলল, কী মশাই, সংসার-টংসার ছাড়ার মতলব আছে। নাকি? দাড়িফাড়ি না কামালে যে বড় উদাসীন দেখায় আপনাকে!

শ্যাম মৃদু হাসে, সংসার কোথায় যে ছাড়ব?

মিত্র বলে, কেন, আপনার তো মা-বাবা আছেন! তাদের জন্য এবার একটি ডবকা দেখে দাসী এনে ফেলুন।

সে তো আপনিও আনতে পারতেন।

মিত্রকে হঠাৎ খুব গম্ভীর দেখাল। একটু চুপ করে থেকে শ্বাস ছেড়ে বলল, আমার জীবনে একটা ট্রাজেডি আছে মশাই। বলে আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মিত্র মৃদু হেসে গলা নামিয়ে বলল, আমার মশাই, একটা লাভ অ্যাফেয়ার ছিল। সে মেয়েটা তার বিয়ের পর অনেক কেঁদেকেটে আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যেন বিয়ে না করি। তখন সেন্টিমেন্টের বয়স, তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলুম। কিন্তু এখন...মিত্র খাস ছেড়ে বলল, এখন ভাবি কী-সব বোকামি! এ-সব প্রতিজ্ঞার কোনও দাম নেই, কী বলেন?

শ্যাম মোলায়েম গলায় বলে, দূর দূর...

মিত্র নিশ্চিন্ত গলায় বলে, কী জানি মশাই, এখনও কেমন যেন খচখচ করে মনে মধ্যে—

শ্যাম বিস্মিত গলায় বলে, শব্দ হয়?

অ্যাঁ? অন্যমনস্ক মিত্র কথাটা খেয়াল করল না।

শ্যাম মাথা নেড়ে বলল, কিছু না।

হঠাৎ আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে মিত্র বলল, আমার বয়স তেত্রিশ। আমরা মশাই ময়মনসিংহের মিত্র। ঝাড়া হাত পা, একটি বোন ছিল, কাচড়াপাড়ায় বিয়ে দিয়েছি, ছোটভাই সাহারাণপুরে ফিটার, ভাল ফুটবল খেলত। ছিলুম মা আর আমি। তা মা মারা গেলে একটি চাকর রেখে চালাচ্ছিলুম, সে চুরি করতে শুরু করায় তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে এই হোটেলে জুটেছি, কিন্তু এখন মশাই পেটে সইছে না। তা ছাড়া মা মরে গিয়ে বাসাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে... বলে একটু দুঃখের হাসি হাসল মিত্র, আমার মশাই দাবি-দাওয়া নেই। একটু দেখবেন তো...।

এত কথা শুনছিল না শ্যাম। মিত্রের বয়সের কথায় তার মন আটকে ছিল। মিত্রের বয়স তেত্রিশ। তার সন্দেহ হল যে, বিয়ের লোভে মিত্র অন্তত সাত-আট বছর বয়স কমিয়ে বলছে।

মিত্রের এঁটো ডান হাত শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে এসেছিল। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ ঘেন্নায় লাফিয়ে উঠল শ্যাম, বলল, দেখব। তারপর আঁচাতে গিয়ে বেসিনের ওপর আয়নায় নিজের মুখখানা এক পলকে দেখে নিল সে। তেলতেল করছে তার মুখ, অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়ি, অনেক দিন তেল বা শ্যাম্পু না দেওয়া রুক্ষ চুলে তাকে পাগলাটে দেখায়। হাত-আয়নায় রোজ সে মুখ দেখে, কিন্তু এই বড় আয়নায় তাকে অন্য রকম দেখায়। তার মনে হয়, তার দু চোখে এক ধরনের পরিবর্তন এসে যাচ্ছে।

আঁচিয়ে এসে মৌরি মুখে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। ডিসেম্বরের শীতরাত্রির ফুটপাথে সে কয়েকটা ঘুমন্ত ঘেয়ো কুকুরকে ডিঙিয়ে গেল, পেরিয়ে গেল গাড়ি-বারান্দার তলায় শুয়ে থাকা জড়োসড়ো কয়েকটা ভিখিরিকে, যেতে যেতে বাড়ির দেয়ালগুলোতে হাত রেখে শিস দিল সে। সামনেই একটা পার্ক—শীত আর ঘন কুয়াশায় জমে আছে। রেলিং টপকে সে ভিতরে ঢুকল। বেঞ্চিগুলি কঁকা পড়ে আছে। শ্যাম বসে সিগারেট ধরায়। পায়ের স্যান্ডেল ঘাসের শিশিরে ভিজে গেছে, পা বেয়ে শিরশির করে উঠে আসছে শীত, কুয়াশায় দম-চাপা ভাব আর কাঠ কিংবা কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ। শ্যাম নিশ্চিন্ত। মনে বসে থাকে, ঘড়ির দিকে তাকায় না, তার মন গুনগুন করে ওঠে—-উদাসীন, বড় উদাসীন দেখায়। তোমাকে শ্যাম!

আকাশে তারা না, মেঘ না, কিছুই দেখা যায় না। শুধু ধোঁয়ার মতো কুয়াশা তাকে ঘিরে ধরে। বহুদূর দিয়ে মন্থর বিষণ্ণ ট্রাম চলে যাওয়ার শব্দ হয়, টুপটাপ করে অন্ধকারে কোথাও গাছের পাতা কি শিশির ঝরে পড়ে। দূরে কোনও ল্যাম্পপোস্টের ক্ষীণ আভা লেগে কুয়াশা সামান্য হলদে হয়ে আছে, এত ক্ষীণ সেই আলো যে, তাতে শ্যামের ছায়াও পড়ে না। শ্যামের মনে হয়, জীবনের সবচেয়ে সুসময় এইটাই যা সে পেরিয়ে যাচ্ছে।

ভেবে দেখলে এখন তার মন উচ্চাশার হাত থেকে মুক্ত। তার চাকরি যাওয়ার পর ছ’ মাস কেটে গেছে। হাতের জমানো টাকা ফুরিয়ে আসছে ক্রমে। তবু তার কোনও উদ্বেগ নেই। কোনও দুশ্চিন্তাই সে বোধ করছে না। তার পরনে ধুতি-শার্ট আর কবেকার পুরনো একটা এন্ডির চাদর। ছ’ মাস আগে এ-পোশাকে বেরোনোর কথা তার কল্পনায়ও আসত না। দুপুরে তার অফিসে ছিল বাঁধা লাঞ্চ, রাত্রে খাওয়ার স্থিরতা ছিল না তার কোম্পানির মক্কেলদেরই কেউ না কেউ তাকে বড় হোটেলগুলিতে নিয়ে যেত। না, সে সৎ ছিল না, এখনও তার সততার প্রতি কোনও মোহ নেই। ইচ্ছে করলে এবং প্রয়োজন হলে এখনও সে যে-কোনও কাজ করতে পারে, যে-কোনও পাপও। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এখন আর তার ইচ্ছাগুলির কোনও জোর নেই, না আছে কোনও স্পষ্ট প্রয়োজনবোধ। কী করে, কখন কবে তার উচ্চাশাগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, কীভাবেই বা কেটে গেছে উদ্বেগ তা সে টেরও পায়নি। নিজেকে বড় উদাসীন মনে হয় তার। হঠাৎ সুবোধ মিত্রের কথা মনে পড়লে সে ‘আঃ শব্দ করে অন্ধকারেই আপনমনে হেসে উঠল। চল্লিশে এসে মিত্র কাঙালের মতো বিয়ের কথা পাড়ছে এলোপাথাড়ি, পাইস হোটেলে মুখোমুখি খেতে বসে। ইচ্ছে করে মিত্রের কাছে গিয়ে সে তার প্রেমের কাহিনীগুলি শুনিয়ে আসে। হ্যাঁ মশাই, সে-সব মেয়ে কথা আপনি ভাবতে পারবেন না। বৃন্দাকে প্রথম দেখি পার্ক স্ট্রিটের এক রেস্তরাঁয়, সঙ্গে ভালমানুষ গোছের একটি প্রেমিক ছেলে। দু’বার, ঠিক দু’বার সে তাকিয়েছি আমার দিকে–ঈশ্বরকে ধন্যবাদ–যে দিক থেকে আমার মুখশ্রী সবচেয়ে ভাল দেখায়, সেই দিকটাই ফেরানো ছিল তার দিকে; যা মশাই, বাঁ দিক থেকেই আমাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। আমি তারপর সোজা উঠে গেলুম তাদের টেবিলের কাছে, বৃন্দার দিকে চোখ রেখে আমি ছেলেটার দিকে হাত বাড়ালুম–দেশলাইটা। বিরক্তির সঙ্গেই বোধহয় ছেলেটি দেশলাই এগিয়ে দিলে। অপ্রয়োজনে সিগারেট ধরাতে ধরাতে আমি বৃন্দার দিকে চেয়ে একটু হেসেছিলাম। সেই হাসি আমি শিখেছিলুম কলকাতার সবচেয়ে সেরা বদমাশদের কাছ থেকে। অনেক বার ও রেস্তরাঁ ঘুরে তা আমাকে শিখতে হয়েছিল। তার পরদিন বৃন্দা সেই রেস্তরাঁয় এসেছিল একা। কী করে সে তার প্রেমিক সঙ্গীটিকে কাটিয়ে এসেছিল তা আমি আজও জানি না। হ্যাঁ মশাই, তারপর বৃন্দাকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পেরেছিলুম।

কিংবা মাধবীর কথা ধরা যাক–যাকে আমি প্রথম দেখি এক ফিল্ম ক্লাবের শোতে। যার নীল রঙের প্লিমাউথ গাড়িটাকে আমার ভাড়াটে ট্যাক্সি বাঘের মতো তাড়া করেছিল। তারপর মাধবীকেও একদিনা মশাই, তারপর মাধবীও একদিন বলেছিল–দিন দিন তুমি কী হয়ে যাচ্ছ শ্যাম, তুমি ইতরের মতো তাকাতে শিখেছ বলতে বলতে সে তার নরম মেরুদণ্ড পিছনে হেলিয়ে। ভেঙে দিয়েছিল সবুজ ডিভানে। তবু বলি, আমার মন ছিল হাঁসের শরীর। আমার শরীরের ভিতরে ছিল বিশুদ্ধ বাতাস, আর উজ্জ্বল রক্ত। কোনও দিন কখনও কোনও মেয়ের জন্য আমি হাঁটু ভেঙে প্রার্থনায় বসিনি। বলিনি–দয়া করে আমাকে ভালবাসো। কেননা তার দরকার ছিল না। শুধু ওই মেয়েটি, ওই আটপৌরে ইতু কোনও দিনই বিয়ে করার কথা ভুলতে পারল না। যেমন পারেননি আপনি। কেমন সেই মেয়ে যার প্রেমে আপনি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত টিকে গেলেন। প্রেমের নামে আমি মশাই শিস দিই, আমার চোখ ইতর হয়ে যায়, আমার ঠোঁটে ফুটে ওঠে সেই হাসি। আমি প্রেম ওইরকম বুঝি মশাই। আমার কেবল ভয় ওই আটপৌরে মেয়েদের, চার দিন কথা বলার পর যারা পাঁচ দিনের দিন মিনমিন করে বলে, বাবা বলছিল, ছেলেটাকে একবার নিয়ে আসিস তো খুকি, দেখব। হাগো মিত্তিরমশাই, আপনার জুলিয়েটটি কেমন ছিল? ওই রকম আটপৌরে তো, শেষ পর্যন্ত দেখুন এত বয়সেও আপনাকে হাফ-সন্ন্যাসী করে রেখে গেছে! বিয়ে করবেন? তা আপনার কপালে ওইরকম আটপৌরেই জোটার সম্ভাবনা, যে আর-একজন সন্ন্যাসী বানিয়ে আপনার ঘর করতে আসবে নিশ্চিন্ত মুখে। তার সেই প্রেমিকের স্মৃতি তার চন্দনের হাতবাক্স বা গোপন চিঠির মতো, মাঝে মাঝে পানের বাটার সামনে বসে না ছেলে মানুষ করতে করতে মনে মনে নেড়েচেড়ে দেখবে। ঈশ্বর! আমার ভাগ্য ভাল যে, আমার শরীরের ভিতরে এখনও রয়েছে বিশুদ্ধ বাতাস, আর উজ্জ্বল রক্ত। কখনও কোনও মেয়ের জন্য আমি হাঁটু গেড়ে বসিনি প্রার্থনায়। আমার মন মশাই, হাঁসের শরীর। হ্যাঁ, চমৎকারভাবেই আমি এতকাল মেয়েদের ব্যবহার করে এসেছি। আঁচলের গেরোয় বাঁধা পড়িনি। আমি নিষ্কলঙ্ক ও বিশুদ্ধ। আজ আমার দুরবস্থা দেখে ভাববেন না। সেই তরমুজ বিক্রেতার কথা ভেবে দেখুন, যে বলেছিল, আমরা কি ভগবানের হাত থেকে কেবল ভালটাই গ্রহণ করব, মন্দটা নয়? তা আমার অবস্থা এমন কিছু খারাপও নয়।

চাকরি নেই, কিন্তু যে-কোনও সময়ে চাকরি হয়ে যেতে পারে। দরকার একটু ঘোরাঘুরির উৎসাহ। দাড়িটা যদি কামাই, ছ' মাস আগেকার প্যান্ট-শার্ট-টাই যদি গায়ে দিই, আর চোখের সেই অভ্যস্ত চাউনি আর হাসিটা যদি দু-একদিন অভ্যেস করে নিই, তবে অল্পদিনেই আবার আমার চারদিকে চাঁদের জেল্লা লেগে যাবে। হায়, শুধু কেবল কেন যেন উৎসাহ পাই না আর! আঃ, আমার হাই উঠছে।

বাস্তবিক শ্যামের হাই উঠছিল। কুয়াশা আরও একটু ঘন হয়েছে। তার শীত করতে থাকে। দূরে কোথাও ফুটপাথে পাহারাওলার লাঠি ঠোকার আওয়াজ হচ্ছে। ঘড়ি এই আলো-আঁধারিতে দেখা যায়, সে সময় আন্দাজ করার চেষ্টা করল। বুঝতে পারল না। কুকুর কাঁদছে, শোনা যাচ্ছে ক্ষীণ কণ্ঠের একটু গান। শ্যাম উঠে পড়ল।

সেই রাত্রে শ্যাম ছোট হাত আয়নায় তার মুখখানা পবিত্র গ্রন্থের মতো পাঠ করল রাত জেগে জেগে। উদাসীন! বড় কি উদাসীন দেখায় আমাকে! ভাবতে ভাবতে শ্যাম হেসে উঠল। গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। তারপর অতর্কিতে ঘুমিয়ে পড়ল আলো না নিভিয়ে।

শীত এসে গেছে। কলকাতার স্বল্পস্থায়ি শীত। বাতাসে শৌখিন ঠান্ডা ভাব। রোজ সকালে অল্প কুয়াশা হয়, রোদেব রং থাকে লাল। আগে যখন সাড়ে আটটায় অফিসে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়তে হত, সেই তখনকার পুরনো অভ্যাসমতোই সকালে ঘুম ভেঙে যায় শ্যামের। ভোরের জানালার দিকে সে এক পলক চেয়ে দেখে, তারপর আবার চোখ বুজে বালিশ আঁকড়ে ধরে, চোখের ওপর লেপ টেনে আলো ঢেকে দেয়। শরীরের ভিতরে জ্বরভাব, শীত আর সামান্য মাথাধরা নিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। শরীর তাজা রাখার জন্য সে আগে ভোরে উঠে সামান্য ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম করত, কয়েকটা বেন্ডিং, আর। তিন-চারটে আসন। সে কথা ভাবতেই এখন ক্লান্তিতে হাই ওঠে তার। চোখ বুজে সে পুরনো শ্যামকে দেখতে পায়। দেখে, সে মেঝেতে ব্যাঙের মতো হাত-পা ছড়িয়ে ডন মারছে, কখনও নিচু হয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল ছোঁয়ার চেষ্টা করছে, কখনও বা বাতাসে ঘুষি ছুঁড়তে ছুঁড়তে অদৃশ্য প্রতিপক্ষকে তাড়া করে ফিরছে ঘরময়। সেই ঘুষিতে একবার রূপশ্রী ফার্নিচার্সের ওয়ার্ডরোবটার একটা পাল্লা চোট খেয়েছিল, আর দেয়ালের দুর্বল একটা

জায়গার চুনবালি খসে পড়েছিল বলে বড় খুশি হয়েছিল শ্যাম। পুরনো সেই শ্যামের শরীর নিয়ে এইসব অর্থহীন নাড়াচাড়া মনে কবে সে হাসে, তারপর দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শোয়। শরীরের ওপর বড় মায়া ছিল শ্যামের, সবসময়ে নিজেকে সে চোখে চোখে রাখত। সে খুব সতর্কভাবে রাস্তা পার হত, সুন্দর ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠত কিংবা নামত, সন্দর ভঙ্গিতে টেলিফোন তুলে নিত কানে– সবকিছুতেই তখন বড় মনোযোগ ছিল তার। যেন কখনও কোনও সময়েই তাকে। কুৎসিত না দেখায়।

লেপের ভিতরে একটা খোদল তৈরি করে শুয়ে থাকে শ্যাম। আস্তে আস্তে বেলা গড়িয়ে যায়। খোঁদলের ভিতর তার নিশ্বাস আর গায়ের তাপ জমে ওঠে। মুখের ঢাকা সরালে চোখে আলো এসে লাগে। এরকম অবস্থায় একসময়ে তাকে বিছানা ছাড়তেই হয়। উঠে সে স্নান করে নেয়, সিগারেট ধরিয়ে ঘরময় পায়চারি করে। মাঝে মাঝে এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করে। ঘরেই রয়েছে তার চায়ের সরঞ্জাম কেরোসিন স্টোভ, কেটলি, চা, চিনি, দুধের কৌটো। চাকরির সময়ে সে সকালের সামান্য অবসরেই চা তৈরি করত, ডিম সিদ্ধ করে খেয়ে নিত। এখন আর তার অত সময় নেই। গত কয়েক মাসে কৌটোর চায়ে ছাতা ধরেছে বোধহয়, হয়তো পচে গেছে টিনের দুধ–সে খুলে দেখেনি। এখন ইংরিজি খবরের কাগজখানা মেঝেয় পায়ের নীচে লুটোপুটি খায়, আগে সেখানার কদর ছিল–সকালে আগাপাশতলা চোখ বুলোত, রাত্রে ফিরে কখনও কখনও ভাল করে খুঁটিয়ে পড়ত।

বেলা আর-একটু বাড়লে সে হোটেলের দিকে বেরিয়ে পড়ে। তারপর সোজা চলে যায় দুপুরের ফাঁকা কোনও বাস বা ট্রাম টার্মিনাসে বা স্টপে। চেনাশোনা লোকের সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না। হলেও শ্যাম এড়িয়ে যেতে পারে। তার গালে দাড়ি, চুল বড় বড়, এবং ভাগ্যক্রমে সে অনেকটা রোগা আর কালো হয়ে গেছে, হাঁটাচলার ভঙ্গিও পালটে ফেলেছে অনেকটা, তা ছাড়া সে ভেবেচিন্তে একটা রোদ-চশমা কিনে নিয়েছে। সব মিলিয়ে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক তার ছদ্মবেশ। এই আড়াল থেকে সে মাঝে মাঝে দু-একজন চেনা মানুষকে অসতর্ক অবস্থায় দেখে নেয়। একদিন মাধুকে দেখল শ্যাম। দিব্যি মোটাসোটা হয়েছে মাধু, চর্বিতে থলথল করছে শরীর, এই শীতেও ঘামছে। ঘামে আর

চর্বিতে নাকের ভারী চশমাটা পিছলে নেমে এসেছে অনেকটা। পায়ের একটা স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে, সেই ছেড়া চটি হাতে নিয়ে খুবই বিপন্ন আর চিন্তিত মুখে ট্রামের সিটে বসে আছে মাধু। আরও লক্ষ করল শ্যাম মাধুর গায়ে নতুন মটকার পাঞ্জাবি, ধোয়া ধুতি পরনে, কাঁধে শাল আর শালের নীচে শান্তিনিকেতনি ঝোলা ব্যাগ। বছরখানেক আগে যখন দেখা হত, তখন বাইরে মফসসলের কোথাও মাস্টারি করত মাধু, তখন ওর মায়ের ক্যান্সার, প্রায়ই কলকাতায় ছোটাছুটি করতে হত। শ্যামকে কতবার বলেছে মাধু– আমাকে কলকাতায় একটা চাকরি জুটিয়ে দে শ্যাম, মফসসলে লাইফ নেই। তা ছাড়া আমার মায়ের ক্যান্সার...। বিশুষ্ক আর উদভ্রান্ত দেখাত মাধুকে, শ্যামের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে পারত না, চাকরবাকরের মতো ব্যবহার করত। মৃদু হেসে তাই মাধুকে এড়িয়ে যেত শ্যাম। ভিড়ের ভিতরে রড ধরে দাঁড়িয়ে বিকেলের ট্রামে মাধুকে ভাল করে লক্ষ করছিল শ্যাম। মাধুকে বেশ তৃপ্ত দেখাচ্ছিল শুধু স্ট্র্যাপ-ছেড়া চটিটার জন্যেই যা একটু চিন্তিত বোধ হয়। ধার দিয়ে শ্যামের মনে থাকে না, ধার নিয়েও নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজ তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল মাধুর কাছে তার পঁচিশটা টাকা পাওনা আছে। মনে হচ্ছে, মাধুর অবস্থা এখন ভালই। মাধুর কাছে টাকাটা চেয়ে বসলে কেমন হয়? ভাবতেই হাসিতে তার গা শিরশির করে উঠল। একট্রাম ভিড়ের মধ্যে বেশ গলা ছেড়েই টাকাটার কথা বলা যাবে। ভেবে ভিড়ের মধ্যে ঠেলেঠুলে সামান্য এগিয়ে গিয়েছিল শ্যাম, হঠাৎ মাঝপথে থেমে সে নিশ্বাসের সঙ্গে গালাগাল দিল– শালা হারামি, বিট্রেয়ার। কেন না মাধুর পাশে জানালার ধার ঘেঁষে বসে আছে সুন্দর কটকি ছাপের শাড়ি-পরা অল্পবয়সি একটি বউ-মাধুর বউ সন্দেহ নেই। ভিড়ে এতক্ষণ বউটি আড়াল ছিল। জানালার কাঠে কনুইয়ের ভর, হাতের চেটোয় রেখেছে মুখ, সে মুখ। জানালার দিকে ফেরানো। শ্যাম গলা বাড়িয়ে দেখছিল। খেয়াল ছিল না, তার খোঁচা দাড়ির ঘষা লাগল মোটামতো একটা লোকের ঘাড়ে। লোকটা মুখ ফিরিয়ে নীরবে চোখ দিয়ে একটা ধমক দিলে শ্যাম সামান্য পিছিয়ে আসে। বস্তুত মাধুর মা যে আর বেঁচে নেই তা মাধুর তৃপ্ত মুখচোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। আর ওই বউটা বোধহয় মাধুর মায়ের শেষ ইচ্ছে। ছেলের বউ না দেখে মরবেন না এরকম একটা বায়না ধরেছিলেন বলেই বোধহয় মাধু তাড়াহুড়ো

করে বিয়েটা করে ফেলেছে। নইলে ওর যা রোজগার তাতে বিয়ে করার কথা নয়। অবশ্য মা মরে গিয়ে থাকলে এখন মাধুর খরচ কিছুটা বাঁচছে। কে জানে, হয়তো মা মরে যাবে হিসেব করেই সামান্য ঝুঁকি নিয়ে বিয়েটা করেছে ও। শ্যাম আবার মনে মনে বলল, শালা বিট্রেয়ার। অকারণেই মাধুর ওপর তার রাগ হচ্ছিল। ঠান্ডা মাথায় সে ভেবে দেখল এখন মাধুকে দু'ভাবে বিপদে ফেলা যায়। সোজা ওর কাছে গিয়ে বলা যায়, আরে মাধু!

ভীষণ চমকে উঠে তাকে দেখে অস্বস্তির হাসি হাসবে মাধু, শ্যাম! ইস, তোকে চেনাই যায় না! তারপর...?

তুই একটু মুটিয়েছিস। বলেই হেসে চোখের ইঙ্গিত করবে শ্যাম, বউটিকে দেখিয়ে ভ্রূ নাচাবে, কে?

এঃ হেঃ, তোকে খবর দিইনি বুঝি! এ হচ্ছে মাধুরী, আমার বউ। তারপর প্রায় জলে পড়ে গিয়ে বউয়ের দিকে মুখ নামিয়ে বলবে, মাধুরী, এই শ্যাম, আমার বন্ধু। এর কথা, তারপর শ্যামের দিকে ফিরে বলবে, তোর অফিসে কিন্তু খবর দিতে গিয়েছিলুম। ওরা বলল তোর চাকরি গেছে।

ব্যস, ওটুকুতেই শ্যাম ওকে অপমান করার যথেষ্ট কারণ পেয়ে যাবে। সকলের সামনে ও তার চাকরি যাওয়ার কথা কেন বলল? তখন সে মৃদু হেসে বলবে, হ্যাঁ, গেছে। বড় কষ্টে আছি ভাই। তারপর গলা সামান্য খাটো করবে শ্যাম এমনভাবে, যেন বউটি এবং কাছাকাছি কয়েকজন শুনতে পায়, মাধু, তোর কাছে যে টাকাটা পাওনা আছে—

মাধু, বিপন্ন মুখে, কোনটা বল তো!

ওই যে রে শালা, গত শীতে এক রাতে মাল খাবি বলে নিয়েছিলি! মনে নেই? বলতে বলতে শ্যাম লক্ষ করবে বউটি নড়ে উঠল একটু।

মাধু ভীষণ ভয় পেয়ে বলবে, আমি?

হ্যাঁ রে শালা, এক শনিবার, তুই রেসের মাঠে পঁয়ষট্টি টাকা হেরে গেলি! পবননন্দন আর টিটানির ওপর ডাবল ধরেছিলি–মনে নেই। তারপর খালাসিটোলা–

জীবনে মদ খেয়েছে মাধু–এমন মনে হয় না। তবু শ্যাম জানে এসব কথা চাপা দেওয়ার জন্যেই কাষ্ঠহাসি হেসে মাধু বলবে, ওঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, শ্যাম, কী রোগা হয়ে গেছিস! একদিন আয় না, কলকাতাতেই বাসা করেছি এখন, এখানেই চাকরি।

সঙ্গে সঙ্গে শ্যাম বলবে, যাব। ঠিকানাটা–?

বিমর্ষ মুখে মধু ঠিকানা বলে যাবে, বলবে, টুইশ্যানির জ্বালায় ঘরে থাকা যায় না রে ছুটির দিনে আসিস। আগে খবর দিবি, নইলে সিনেমা-টিনেমায় হয়তো গেলুম–

বস্তুত ঠিকানা দিয়ে মাধু আর-এক ধরনের বিপদে পড়বে। মৃদু বিষের মতো সেই বিপদ। কেননা মাধু দেখেছে কেমন কৃতিত্বের সঙ্গে অনায়াসে মেয়েদের ব্যবহার করে শ্যাম! তা ছাড়া শ্যামের না আছে বাছবিচার, না আছে ধর্মবোধ। ঠিকানা দিয়ে তার সেই ভয় হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে বউটি ঠিকঠাক সতী হলেও কোনও লাভ নেই। বউকে বিশ্বাস করবে এমন মনের জোর মাধুর কোথায়?

এ-সব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আপন মনে হেসে উঠল শ্যাম। কাছাকাছি লোকেরা তার দিকে চেয়ে দেখল। মাধু নেমে গেল কালীঘাটে, গোয়ালন্দের স্টিমারের মতো ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এক হাতে সসংকোচে ধরে থাকা ছেড়া চটি, পিছনে বউ। তার দিকে ফিরেও তাকাল না। বউটির ঘোমটাব পাড় শামের থুতনি ছুঁয়ে গেল। নেমে দাঁড়াতে একটু গলা বাড়িয়ে দেখল শ্যাম–বউটা মাধুর সমান লম্বা। স্টপ ছেড়ে যাচ্ছে ট্রাম, এ সময়ে শ্যামের মনে হল, একটা কিছু করলে হত। তার সামান্য আফসোস হচ্ছিল। তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সেই মোটা লোকটা। শ্যামের ইচ্ছে হচ্ছিল তার ঘাড়ে আর-একবার দাড়ি ঘষে দেয়। তারপর একসময়ে সে মনে মনে মাধুকে মুক্তি দিয়ে বলল, তুই আরও সুখী হয়ে যা মাধু, তুই আরও মোটা হয়ে যা। তোকে পঁচিশ টাকা ছেড়ে দিলুম। আশীর্বাদ করছি,

তোকে যেন বেশি হাঁটতে না হয়, যেন কাছাকাছিই তুই একটা মুচি পেয়ে যাস। মনে মনে এই কথা বলে খুব তৃপ্তি পেল শ্যাম।

আর-একদিন হঠাৎ ডবলডেকারে কলেজে স্ট্রিট পেরিয়ে যেতে যেতে দোতলা থেকে শ্যাম একঝলক দেখতে পেল আরপুলি লেনের মুখে দেয়ালে ঠেস দিয়ে মিনু দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে একটা শেয়াল রঙের পুলওভার, পরনে কালো চাপা একটা প্যান্ট, পায়ে হকিবুট। বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত, একটা হাঁটু ভাজ করা পা পিছনের দেয়ালে তোলা, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে মিনু। হঠাৎ দেখলে মনে হয় ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু শ্যাম জানে মুহূর্তেই ওই ভঙ্গি মিনু বদলে ফেলতে পারে, শরীরের ভাঁজ খুলে যখন সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন তার কালো লম্বা চেহারাটা লকলক করে ওঠে। একঝলক মিনুকে ওইভাবে দেখে শ্যামের মন মিনু' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল। নামবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিল। তারপর দেখল বাসে বেজায় ভিড়, নামতে নামতে সে আরও দুটো স্টপ ছাড়িয়ে যাবে। অরপর পিছু হঠে এসেও যে মিনুকে ওইখানে পাওয়া যাবেই তার কোনও স্থিরতা নেই। তা ছাড়া, দেখা হলেও সবসময়ে লাভ হয় না। হাতে কাজ থাকলে তাকে চিনবেই না মিনু। অল্প একটু হেসে হয়তো বলবে, "আরে শ্যাম! কেমন আছিস?' তারপর ঘুম-ঘুম স্বপ্নের মতো উদাসীন চোখে তার দিকে চেয়ে থাকবে খানিকক্ষণ, বলবে 'আঃ শ্যাম, আজ তুই কেটে পড়, আমার কাজ আছে।' কী কাজ!' মাথায় সামান্য আঙুল চালিয়ে ঠান্ডা গলায় বলবে মিনু, 'ঝামেলা হবে এক্ষুনি। তুই কেটে পড়।' এ-সব কথা। যখন বলে মিনু তখন তার গলার স্বরে এক ধরনের চমক লক্ষ করেছে শ্যাম। হঠাৎ মনে হয় মিনুর গলায়। মাইক্রোফোন লাগানো আছে। স্বর খুব উঁচু নয়, তবু মনে হয় তা খুব গভীর কুয়োর ভিতর থেকে আসছে। ওই স্বর শুনে যে-কোনও লোকের বুকের ভিতর গুরগুর করে উঠতে পারে।

মিনুর সঙ্গে একবার দেখা বছর আট-দশ আগে। তখন শ্যাম ছোট্ট একটা কোম্পানিতে দু'শো টাকার একটা সামান্য কাজ করে। এক তারিখে মাইনে পেয়ে সে ভিড়ের বাসের দরজায় ঝুলে ফিরছিল। কালীঘাটের স্টপে বাস থেমে ছাড়ার মুহূর্তে শ্যাম অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল কেউ তার নাম ধরে ডাকছে। বাস ছেড়ে দিল। কিন্তু শ্যাম টের পেল ভিড়ের

মধ্যে লোহার মতো শক্ত একখানা হাতের পাঞ্জা তার কনুইয়ের ওপর চেপে ধরেছে। পরমুহূর্তেই সেই হাতখানা তাকে বাসের হাতল থেকে ছিঁড়ে আনল। কার মাথায় শ্যামের দাঁত ঠুকে গেল, আর একখানা কনুই লাগল বুকে। দরজার লোকেরা চেঁচিয়ে উঠেছিল, বাসটা থামতে থামতেও থামল না। বাতাস আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় শূন্যে হাত তুলে টাল খেয়ে ঘুরে ফুটপাথে আছড়ে পড়ে যাচ্ছিল শ্যাম। কিন্তু যে তাকে ধরেছিল সে তাকে পড়ে যেতে দিল। দাড় করিয়ে দিল। ব্যথায় চোখে জল এসে গিয়েছিল শ্যামের, মাথার ভিতরে ধোঁয়াটে ভাব। তাই সে কিছুক্ষণ বুঝতেই পারল না যে, কে তাকে টেনে নামিয়েছে। তারপর অবশেষে সে মিনুকে দেখতে পেল। শীতকালে মিনুর সেই মার্কামারা পোশাক–শেয়াল রঙের পুলওভার আর কালো চাপা প্যান্ট। মিনু হাসছে। দু'-একজন চলতি লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তাই মিনু তার হাত ধরে একটু দূরে নিয়ে গেল।

মুখোমুখি দাঁড়ালে মিনু তার দীর্ঘ লোহাব রডের মতো শক্ত ডান হাতখানা বাড়িয়ে শ্যামের কাঁধে আলতোভাবে রেখে নিঃশব্দে হাসল, তোর লেগেছে শ্যাম? শ্যাম মৃদু হেসে মাথা নাড়ল, না। আবার নিঃশব্দে হেসে ডান হাতখানা খুব ধীরে ধীরে তার কাধ থেকে সরিয়ে নিয়ে প্যান্টের পকেটে রাখল। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হয় দু পা মাটিতে পুঁতে দাঁড়িয়ে আছে, একটুও নড়ানো যাবে না। এমনিতে মিনুর চোখ সুন্দর-টানা, ভাসা ভাসা। চোখের পাতায় অর্ধেক ঢাকা আধ-ঘুমন্ত চোখে উদাসীন বিবাগ নিয়ে চার দিকে চেয়ে দেখে। কিন্তু যখন কখনও হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর মিনু তাকায়, তখন এক পলকে ওর চেহারা পালটে যায়। দয়াহীন, নিষ্ঠুর মিনুকে তখন আর চেনা যায় না। অল্প - কোচকানোর ভিতর দিয়ে মিনু প্রায় ম্যাজিক দেখাতে পারে। শ্যাম তখন ভাল ছেলে। তাই সামান্য অস্বস্তি নিয়ে মিনুর সেই শান্ত, আধখোলা, আধ-ঘুমন্ত চোখের দিকে চেয়ে রইল। সে স্পষ্টই বোঝাতে চেয়েছিল। আমি খুশি হইনি...তোকে দেখে খুশি হইনি মিনু।

অনেকক্ষণ চিন্তিতভাবে শ্যামের মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ মিনু বলল, আজ এক তারিখ, তোর কাছে আজ অনেক টাকা আছে, না? শ্যাম বুঝতে পারছিল ছেলেবেলার

পুরনো বন্ধুর সঙ্গে একটু কথা বলার জন্যই যে মিনু তাকে বাস থেকে টেনে নামিয়েছে তা নয়। মিনুর সঙ্গে দেখা হলে শ্যাম যে খুশি। হয় না তা বোধহয় মিনু জানে। বস্তুত তাদের আর বন্ধু বলা যায় না। শ্যাম তাই মিনুর মুখের দিকে। তাকিয়ে কিছু আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল। অকারণেই একটা ভয় পেয়ে বসছিল তাকে। বিকেলের রাস্তায় অনেক লোক রয়েছে তাদের চার পাশে, তবু শ্যামের নিজেকে বড় একলা মনে হচ্ছিল। মিনুকে কী ভীষণ ঢ্যাঙা আর কালো দেখাচ্ছে! শ্যাম মিনুর মুখের দিকে চোখ রেখে অল্প মাথা নেড়ে বলল, আজ মাইনে পেয়েছি।

মিনু দু' পকেটে হাত রেখে কাধ দুটো অল্প তুলে আবার নিঃশব্দে হাসল, জানতুম। তাই তোকে ও-বাসটায় যেতে দিলুম না। বাসটা গরম ছিল। গরম' কথাটার অর্থ শ্যাম যে একেবারে বোঝে না তা নয়। তবু চুপ করে চেয়ে রইল। মিনু সস্নেহে হেসে বলল, ও বাসে যে ছোকরারা ছিল তারা আমার চেনা, ওদের হাত খুব পরিষ্কার, তুই টেরও পেতিস না। শুনে শ্যাম চকিতে তার পকেট দেখবার জন্য হাত বাড়াতেই মিনু হাত তুলে হাসল, ভয় নেই। সব ঠিক আছে। আমি দেখে নিয়েছি। মিনুর অলস, নিস্তেজ উদ্দেশ্যহীন চোখের দিকে চেয়ে শ্যাম হেসে ফেলল, ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি। কী চোখ তোর? বস্তুত তখন শ্যামকে দেখছিল না মিনু, কিছুই দেখছিল না। তবু শ্যাম বুঝেছিল মিনু কতদুর দেখে, কতদূর দেখতে পায়। মিনু হাসে, ফিকে নিঃশব্দ হাসি। সে-হাসিতে কোনও ইচ্ছে বা প্রাণ নেই। শ্যাম হঠাৎ টের পাচ্ছিল, যদিও তার টাকা কটা মিনুর জন্যই আজ বেঁচে গেল, তবু তার ভিতরে এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ জাগছে না। মিনুকে সত্যিই আর ভালবাসে না বলে শ্যাম মনে মনে লজ্জা পেল। এ উচিত নয়, এ রকম হওয়া উচিত নয়। এই বিশ্রী ঠান্ডা সম্পর্ক কাটিয়ে দেওয়ার জন্য সে তাড়াতাড়ি বলল, মিনু, চা খাবি? চল, তোর সঙ্গে অনেককাল কথাবার্তা হয় না।

শ্যামের কথা শুনছিল না মিনু। সে হঠাৎ শ্যামকে ভুলে গিয়ে উপেক্ষা করে চকিতে ঝলসানো চোখে ডাইনে বাঁয়ে আর পিছু ফিরে কী যেন বিদ্যুৎগতিতে দেখে নিল। পরমুহূর্তেই আবার অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে হাসল মিনু, পুলওভারটা টেনে কোমরের চওড়া

বেল্টের যে সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছিল তা ঢেকে দিল। বলল, আমি একা নই শ্যাম, আমার সঙ্গে তোক আছে। শ্যামের বুকের ভিতরে আবার গুরগুর শব্দ হচ্ছিল। মিনুর পিছনে হলদে রঙের গির্জা বাড়ি, সামনেই বাসস্টপে লোকের ভিড়, একটু সামনে একটা পার্ক শীতের নিষ্পত্র গাছে কাক বসে আছে, ধুলো-ময়লা মাখা ক্লান্ত মানুষেরা হেঁটে যাচ্ছে। এর মধ্যে কোথায় রয়েছে মিনুর লোকেরা, তা ভেবেও পেল না শ্যাম। সে জিজ্ঞেস করল, কোথায় তোর লোক? মিনু আবার হাসে, ভিড়ের মধ্যে মিশে আছে, তুই দেখতে পাবি না। তার চেয়ে চল, তোকে এগিয়ে দিই, একটা ঠান্ডা বাসে উঠে চলে যাবি। শ্যাম বুঝতে পারছিল মিনুর একটা আলাদা সমাজ আছে, যেখানে সে শ্যামের মতো নীতিপরায়ণ লোকদের একেবারেই পাত্তা দেয় না। সেখানে সে মিনুর কাছে শিশু। ছেলেবেলায় মিনুর সঙ্গে তার কত গোপন কথার অংশীদারী ছিল। আর এতদিনে তার এবং এই প্রায়-অচেনা মিনুরও আরও কত গোপন কথা তৈরি হয়ে গেছে, যার খবর কেউই আর রাখে না। তবু শ্যাম চলে যেতে পারছিল না। তার মনে হল মিনুকে আরও কিছু ভাল কথা বলা দরকার যাতে মিনুর ভাল হয়। সে বলল, মিনু, তোর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। মিনু ভ্রূ কুঁচকে বলে, কী কথা! শ্যাম বিকারহীন গলায় বলে, আছে। মিনু ওর দুটি চোখের গভীর পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, ঠিক আছে। একদিন তোর বাসায় যাব। মাংস রাঁধব দু'জনে। তারপর সারা দুপুর তোর কথা শোনা যাবে। শ্যাম মিনুকে দেখছিল না, সে লক্ষ করল অদূরে রাস্তার মোড়ে গির্জার বাইরে রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দুজন লোক পাশাপাশি। তারা একবারও মিনু বা তার দিকে তাকাল না, নিঃশব্দে যেন হাওয়ার ভিতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে ওইখানে দাঁড়াল। তারা সিগারেট ধরিয়ে উদাসীন চোখে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। তাদের পরনে সাধারণ ধুতি আর শার্ট, শার্টের হাতা গোটানো। হঠাৎ দেখে কিছুই মনে হয় না, সাধারণ চেহারার দুটি লোক। কিন্তু কেন যেন ওদের দাঁড়ানোর ভঙ্গি বা তাকানোর নিস্পৃহতা দেখে শ্যামের মনে হয়– এরা বড় নিষ্ঠুর। মিনুর সঙ্গে এদের কোথাও মিল আছে। ওদের ওই অলস ভঙ্গি লোককে দেখানোর জন্য। আসলে কোনও কোনও কাজে ওরা ভয়ংকর রকমের নিপুণ। হঠাৎ শ্যাম মিনুর দিকে চেয়ে হাসল, তোর সঙ্গে কজন লোক মিনু? ওই দু'জন তো! বলে আঙুল তুলে

লোক দুটোকে দেখায় শ্যাম। তড়িৎগতিতে মিনু তার দীর্ঘ শক্ত হাতে শ্যামের হাত টেনে সরিয়ে দিয়ে বলে, আঙুল দেখাস না। সামান্য চঞ্চল দেখায় মিনুকে, তবু সে মুখে হাসি টেনে বলে, ওই দু'জন। আরও চারজন আছে। তোর বেশ চোখ আছে শ্যাম! কিন্তু এবার তুই বাড়ি যা। শ্যাম সামান্য মজা পেয়ে হেসে উঠে বলল, সঁড়া, মিনু। তারপর যেন মিনুর দেওয়া কোনও ধাঁধার উত্তর খুঁজছে ঠিক এভাবে সাবধানে চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলে, আরও চারজনকে আমি ঠিক খুঁজে বের করব। মিনু শক্ত হাতে তার কাধ ধরে বলল, তোকে খুঁজতে হবে না, আমার সঙ্গে একটু হেঁটে আয়, দেখিয়ে দিচ্ছি। বলে তার দিকে পিছু ফিরে মিনু হেঁটে যেতে লাগল দীর্ঘ শ্লথ পায়ে। শ্যাম পিছু নিল। দু-চার পা হেঁটেই মিনু দাঁড়াল, পিছু ফিরে শ্যামকে বলল, দ্যাখ! শ্যাম মিনুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, কোথায়! মিনু মাথা হেলিয়ে রাস্তার ওপারে ফুটপাথটা দেখিয়ে বলল, ও পাশে চায়ের দোকানটার সামনে দ্যাখ দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, একজন বেঁটে, গায়ে সুরকি রঙের পুলওভার, প্যান্টের পকেটে হাত, অন্যজন লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান, গায়ে গোল-গলা গেঞ্জি, পরনে আমার মতো কালো প্যান্ট। শ্যাম আস্তে আস্তে বুঝতে পারে বিশেষ কারও জন্যে এই ফাঁদ পাতা হয়েছে। তার হাত পা অবশ হয়ে আসে, তবু প্রাণপণে নিজের গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে বলল, আর দু'জন? মিনু লম্বা মাপা পায়ে সরে গেল, এদিকে আয়। যেভাবে লোকে নিজের ঘরবাড়ি নতুন অতিথিকে দেখায় তেমন স্বাভাবিক ভঙ্গি তার। পার্কটার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে মিনু দেখাল পার্কের গায়ে একটা গলি। নিঃশব্দে আবার হাসে মিনু, যাকে ধরা হচ্ছে আজ সে ওই গলিতে থাকে। গলির মুখে দ্যাখ একটা ট্যাক্সি, মিটার ডাউন করা। পিছনের সিটে একজন, তাকে এখান থেকে ভাল দেখা যাচ্ছে না। গভীর শ্বাস টেনে শ্যাম বলে, আর একজন? মিনু মাথা নাড়ে, আর একজন এখানে নেই, সে আমাদের মক্কেলকে নিয়ে আসতে গেছে। ভুলিয়ে-ভালিয়ে আনবে। শ্যামের মাথার ভিতরটা ধোঁয়াটে লাগে, থরথর করে কাঁপে তার পা। মনে হয় এইখানে এই ভিড়ের মধ্যে মিনু অলক্ষ্যে এক স্টেজ খাড়া করেছে, যেখানে এক্ষুনি একটা নাটক হবে কিংবা নাটকও নয়, কেননা মিনুর এইসব ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু সত্যিকারের রক্তপাত ঘটে যায়। তবু কাষ্ঠ-হাসি হেসে সে বলে, মিনু, তোরা কাকে ধরছিস? মিনু হাসে না আর; তার ঐ সামান্য

কোঁচকানো, তীব্র চোখ, তবু তাকে এই মুহূর্তে খুব ভয়ংকর দেখায় না। যেন বা খানিকটা অসহায়ের মতো ঠোঁট উলটে বলে, কী জানি! তাকে চিনিও না। শ্যাম যেন আপন মনেই নিজেকে প্রশ্ন করে, তবে? মিনু তার কপালের ওপর একটা চুলের ঘুরলি আঙুলে জড়ায়, কেমন অন্যমনস্ক এবং আবার উদাসীন দেখায় তাকে। কিছুক্ষণ পরে সে শ্যামের দিকে। চেয়ে বলে, বাড়ি যা শ্যাম। আবার দেখা হবে। শ্যাম কোনও কথা না বলে মিনুর দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে থাকে, কিছুদূর গিয়ে কেমন চমকে সে ফিরে তাকায়, মিনু তার দিকে চেয়ে আছে। অস্বস্তির চোখ। শ্যাম ফিরে আসে আবার, মিনু, এই দু'জন তোর বন্ধু? যেন বা সে প্রশ্ন করতে চায়—এই দু'জন মিনুর কেমন বন্ধু, যেমন বন্ধু সে একদিন মিনুর ছিল! মিনু সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে দেখে, তারপর মাথা নেড়ে জানায়, হ্যাঁ। শ্যামের কেমন বমি বমি করছিল, সব কিছু ভাল করে লক্ষ করার মতো মনের অবস্থা ছিল না, তবু সে লক্ষ করল মিনুর মুখে-চোখে একটা অসহায় দ্বিধার ভাব। শ্যাম মাথা নেড়ে মিনুকে জানাল যে, সে বুঝতে পেরেছে। তারপর বলল, আচ্ছা মিনু, চলি। মিনু আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, আচ্ছা। শ্যাম বলে, তা হলে একদিন আসছিস তো! ছুটির দিনে আসিস। মিনু মাথা নাড়ে আবার, হ্যাঁ। তারপর হেসে ঠাট্টার ছলে বলে, যদি তত দিন থাকি। এই কথাটুকুই যেন ধাক্কা দিয়ে শ্যামকে মিনুর কাছ থেকে সরিয়ে দেয়। সে দ্রুত বাস-স্টপের দিকে হাঁটতে থাকে। পিছু ফিরে আর তাকায় না।

গির্জার রেলিঙের গায়ে হেলান দিয়ে সেই রকম উদাসীন ভঙ্গিতেই লোক দু'টো দাঁড়িয়ে আছে। তারা দুজনেই অবহেলার চোখে শ্যামকে এক পলক দেখে নেয়। শ্যাম তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, বাসস্টপে এসে দাঁড়ায় গা-ঘেঁষা এক পাল লোকের ভিড়ের মধ্যে। শীত নেই তেমন, তবু শ্যামের হাত-পা-ঘাড়ে কেমন ঠান্ডা লাগছিল। বুকের ভিতরে সেই দুড়দুড় শব্দ— কে যেন দৌড়ে যাচ্ছে, কে যেন পালিয়ে যাচ্ছে বুকের ভিতরে। তার স্বাসকষ্ট হতে থাকে। তখন মাঝে মাঝে শ্যামের এ রকম হত। বুক কাঁপা তার পুরনো রোগ। বাসস্টপের ভিড়, পিছনে দোকানের আলো, ডান দিকে বাঁ দিকে কয়েকটা ম্যাড়ম্যাড়ে গাছ-সবকিছুই বড় নিষ্প্রাণ। এই তো একটু আগে সে অফিস থেকে বেরিয়েছে, ভিড়ে ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠেছে, তারপর মিনু তাকে টেনে নামালতক্ষণ

পর্যন্ত সবকিছু স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এখন হাতে পায়ে জড়ানো শীত, কাঁপা বুক আর অনিশ্চিত একটা উদ্বেগের ভিতর দাঁড়িয়ে থেকে তার হঠাৎ মনে হচ্ছিল, বাস্তবিক এ-শহর তার চেনা নয়। যেমন তার চেনা নয় তার ছেলেবেলার বন্ধু মিনু কিংবা তার দুজন সঙ্গী।

মিনুর জন্যেই সেদিনকার বিকেলটা তার বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। বাসে উঠবার পরও সে সতর্ক হবার চেষ্টা করেনি। হ্যান্ডেল ধরে ঝুলছিল, টের পাচ্ছিল তাকে ঘিরে অনেক হাত, কোনটার কোন উদ্দেশ্য তা বুঝবার চেষ্টাও করেনি সে।

তারপর অনেক দিন ভিড়ের ভিতরে সন্ত্রস্ত চোখে সে চেয়ে থেকেছে। মনে হয়েছে, এদের ভিতরে রুক্ষ চেহারার দয়াহীন কিছু লোক গা ঢাকা দিয়ে ধারালো কঠিন চোখে তাকে লক্ষ রাখছে। দৌড় দৌড়– বুকের ভিতরে সেই শব্দ শোনা যেত। যেন অদূরেই কোথাও মিনুর সেই ছয়জন সঙ্গী বাতাসের সঙ্গে মিশে নিঃশব্দে অপেক্ষায় আছে। অথচ সে জানত যে, এ-ভয় অকারণ। বস্তুত এতই। নিরীহ, নিরামিষ তার জীবন যে, সে কারও ভয়ংকর কোনও ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখে না। তবে কী কারণে তার ওপর ভয়ংকর প্রতিশোধ নেওয়া হবে?

তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের সেই ভিতু অথচ দয়ালু শ্যামের সঙ্গে কারও কোনও দিনই আর দেখা হবে না। মনে পড়তেই শ্যাম নিজেও মৃদু একটু হাসল, স্টেটবাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে ভিড়ের মধ্যে যেন সেই শ্যামকে হেঁটে যেতে দেখল, দেখল শ্যাম মোড়ের ভিখিরির বাটিতে ফেলে দিচ্ছে একটা-দুটো পয়সা, ঠনঠনে পেরিয়ে যাওয়ার সময় সবার অলক্ষ্যে একটু মাথা নিচু করে দ্রুত একবার হাত দুটো জোড় করেই সরিয়ে নিচ্ছে, কিংবা বাসের দরজায় ধরা পড়েছে পকেটমার সেই ভিড় থেকে দ্রুত পায়ে পালিয়ে যাচ্ছে নিরাপদ গলির মধ্যে। ভাবতে ভাবতে শ্যাম মৃদু হেসে মনে মনে বলল, ওঃ শ্যাম দি কাইন্ডহার্টেড!

অনেককাল মিনুর সঙ্গে আর দেখা হয় না। কারণ, ক্রমে ক্রমে শ্যামের চাকরি গেল পালটে, তার চলাফেরা সীমাবদ্ধ হয়ে গেল কয়েকটা বাছাই করা রাস্তায়, অফিস-রেস্তরাঁ

বার কিংবা দক্ষিণের ভাল পাড়ায় তার ছোট্ট একটেরে ঘরটা—এইটুকুর মধ্যেই সুখে আটকে ছিল শ্যাম। আর মিনু ঘুরে বেড়ায় নোংরা গলিখুঁজি, চোরা চায়ের দোকান, চোলাই কিংবা জুয়ার আড্ডায়, পারুল কিংবা চাপার ঘরে। কাছাকাছিই ছিল তারা; তবু দুটো আলাদা শহরে। একটার ভিতরে আর-একটা কিংবা আরও অনেকগুলো কলকাতা পোরা আছে। তারা দুজনেই যে এক শহরে বাস করে, তা নয়। যেমন স্টেটবাসের ডান ধারে বসে সে একরকম দেখছে, বাঁ ধারে বসলে দেখাত অন্য রকম, পাঁচতলার ছাদ থেকে যেমন দেখা যায়, ম্যানহোলের ভিতর থেকে মাথা তুলে দেখলে তেমন নয়। আসলে দিকের তফাত, উঁচু কিংবা নিচু থেকে দেখার তফাত, এক-এক রকম কলকাতা অন্য রকমের কলকাতার ভিতরে ঢুকে আছে। তার ইচ্ছে করছিল এখন গিয়ে একবার মিনুর মুখোমুখি দাঁড়ায়। তার কাঁধে চাপড় মেরে বলে, আঃ হাঃ মিনু! কেমন আছিস গুরু? তারপর গলা নামিয়ে বলে, আমাকে দলে নিবি গুরু? দেখিস শালা, আমি দু'হাতে চালাব মেশিন কিংবা পাঞ্চ, তলপেটে ছোরা ঢোকাব যেন মাখনে, দেখে নিস গুরু কেমন পকাপক চলে সোডার বোতল! তারপর গিয়ে বসে গোপন আস্তানায় চায়ের দোকানের পিছনে অন্ধকার অলিগলির মধ্যে, যেখানে ভয়ংকর সব যুবতীদের ছবিওলা ক্যালেন্ডার ঝোলে দেয়ালে, আর ভোমা নীলমাছি উড়বার শব্দ। সমানে সমানে মিনুর মুখোমুখি বসে অন্তরঙ্গ সুরে মিনুকে বলতে ইচ্ছে করে, কী চলবে গুরু? ঝিট্ না অ্যান্টিক? শ্যাম জানে এ-ভাষা বুঝে নেবে মিনু, কেননা এ মিনুদেরই ভাষা—ঝিট মানে গাঁজা, আর অ্যান্টিক হচ্ছে চোলাই। নেশা জমে এলে আস্তে আস্তে মাথা নাড়বে শ্যাম, না গুরু, তুই ঢকে গেছিস। তোর বয়স শুরু হয়ে গেছে। আমার চেয়ে তুই বছর ছয়েকের বড়, আমার এখন বত্রিশ বোধহয়। তা হলে তোর। যাকগে শালা, এখন কী চলছে তোর? ছিনতাই, না এক-দু'শোর কেপমারি? বোর্ডে ধেড়িয়েছিস? চাপার ঝাপিতে কত গেছে রে শালা! ওরা তো ক্যাশমেমো দেয় না, দিলে ক'হাজারে দাঁড়াত গুরু? ভাবিস না, ভাবিস না মিনু, আমি তোর দিনকাল ফিরিয়ে আনব। উঠতি ছোকরার মতো আমার রক্ত গরম, বুড়োর মতো ঠান্ডা মাথা, গোয়েন্দার মতো চোখ। যে-কোনওভাবে বাঁচতে বা যে-কোনওভাবে মরতে

আমি তৈরি–আঃ গুরু, কী বলব তোকে, একটা উইক পয়েন্টে আমি মার খেয়ে গেছি জোর, মা বাপ তোলা একটা গালাগাল আমি সইতে পারলুম না–

পাশের লোকটি সামান্য ঝুঁকে পড়ে বলল, কিছু বলছেন?

ভয়ংকর চমকে উঠল শ্যাম। বুঝতে পারল, সে বে-খেয়ালে হঠাৎ কথা বলে উঠেছিল। বাসের সামনের বা পিছনের সিটের দু-একজন তার দিকে ফিরে দেখল। বিবেকানন্দ রোডের কাছে ভিড় ঠেলে নেমে গেল শ্যাম।

২. খুব সকালবেলা দরজায় ধাক্কা

খুব সকালবেলা দরজায় ধাক্কা শুনে ঘুম ভাঙল শ্যামের। উঠে দরজা খুলে দেখল, ইতু।

ইতু!

শ্যাম!

এক ঝলক সাদার মধ্যে ইতু দাঁড়িয়ে আছে। তার শাড়ি সাদা, ব্লাউজ সাদা, হাতের ব্যাগটি সাদা, এমনকী তার কপালেও শ্বেত চন্দনের টিপ। শ্যামের ঘুম-জড়ানো চোখে সেই সাদা রং কট কট করে। লাগে। চোখ পিট পিট করে সে হেসে বলল, হাতের বীণাটি কোথায় রেখে এলে!

জানালা দিয়ে ঘরে আসছে রোদ, তার আভায় ইতুকে সুন্দর এবং গম্ভীর দেখায়। ইতু দরজার চৌকাঠ ডিঙোয় না, ওপাশ থেকেই বলে, তোমার ঘরটা একটু গুছিয়ে নাও, শ্যাম। এই বিশ্রী ঘরে কোনও ভদ্রমহিলা আসতে পারে না।

শ্যাম তাড়াতাড়ি তার বসবার চেয়ারটা একটু টেনে আনে ঘরের মাঝখানে, পা দিয়ে সরিয়ে দেয় কয়েকখানা বই, বিছানার লেপটা জড়ো করে রাখে পায়ের দিকে, বলে, তুমি আসবে জানলে আগে থেকেই গুছিয়ে রাখতুম। চেয়ারটা দেখিয়ে বলে, বোসো ইতু।

ইতু চেয়ারে বসে না। হাতের ব্যাগটা ছুড়ে ফেলে বিছানায়, তারপর বালিশ টেনে নিয়ে কনুইয়ের ভর রেখে আধশোয়া হয়। বলে, মুখটুখ যা বোয়ার ধুয়ে এসো, আমি আজ সারাদিন থাকব এখানে।

শ্যাম হাসে।

ভ্রূ কুঁচকে ইতু বলে, তুমি টেলিফোনে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে শ্যাম?

শ্যাম মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

আমি রাজি হয়েছিলুম?

শ্যাম আবার মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

আর কথার মাঝখানে তুমি টেলিফোন রেখে দিয়েছিলে?

শ্যাম লাজুক গলায় বলে, হুঁ।

সামান্য দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ইতু, তুমি কী চাও?

কথা না বলে শ্যাম তাক থেকে তার টুথব্রাশ তুলে নেয়। বাথরুমের দরজায় পা দিয়ে বলে, বোসো ইতু, আমি তোমাকে চা করে খাওয়াব। তারপর দরজা বন্ধ করে দেয়।

বাথরুমে ঢুকে সে খানিকক্ষণ শূন্য চোখে সামনের সাদা দেয়ালটার দিকে চেয়ে থাকে। সারা শরীরে এখন গভীর আলস্য, কোনওখানে এতটুকু উত্তেজনা নেই, আশ্চর্য! সে কল খুলে ঠান্ডা জলের মধ্যে হাত রাখে, হাসে, মনোযোগ দিয়ে জল পড়ার কলকল শব্দ শোনে কিছুক্ষণ, তারপর মন্থর হাতে পেস্টের টিউব খুলতে থাকে।

আধঘণ্টা পর বেরিয়ে এসে সে নীরবে স্টোভ জ্বালো, এতকাল ব্যবহার না করা চিনির কৌটো নামায় তাক থেকে। জমানো দুধের কৌটোয় কঁকানি দিয়ে দেখে, তারপর কৌটোর ফুটোয় চোখ রেখে ভিতরটা দেখে নিয়ে ইতুর দিকে চেয়ে হেসে মাথা নাড়ে, চা হবে না। দুধ শুকিয়ে গেছে।

কী শুকিয়ে গেছে?

শ্যাম কৌটো দেখিয়ে বলে, দুধ।

ইতু সামান্য হাসে, দি মিল্ক অব হিউম্যান কাইন্ডনেস?

খুব জোরে হেসে উঠতে গিয়েও হাসে না শ্যাম, শুধু স্মিতমুখে বলে, আঃ! ইতু, তোমার বুদ্ধি বেড়ে গেছে।

তোমাকে চা করতে হবে না শ্যাম। তুমি আমার কাছে এসো।

শ্যাম কৌটোটা মেঝের ওপর খটাস করে ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে জানালার দিকে সরে যেতে থাকে।

এসো শ্যাম। শান্ত গলায় ইতু বলে।

শ্যাম জানালার চৌকাঠে হাত রেখে রোদে পিঠ আর ইতুর দিকে মুখ রেখে পঁাড়ায়। হেসে বলে, ইতু, তোমাকে খুব পবিত্র দেখাচ্ছে।

আমি তা জানি।

আরও কিছুক্ষণ তোমাকে পবিত্র দেখাক। তারপর–

ইতু দাঁতে দাঁত চেপে বলে, তারপর কী?

শ্যাম মৃদু হাসে, তারপর সারাদিন তো তুমি থাকবেই!

ইতু মাথা নাড়ে, না। দি মর্নিং শোজ দি ডে। কাছে এসো শ্যাম। আমি তোমার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে চাই।

শ্যাম মৃদু মন হাসি হাসে, তোমার বুদ্ধি বেড়ে গেছে ইতু।

কাছে এসো শ্যাম। তোমাকে একবার ছুঁলেই আমি বুঝতে পারব তোমার কী হয়েছে।

যেন নিজের ছেলেকে কাছে ডাকছে এমনি মায়ের মতো আদুরে শোনায় ইতুর গলা। চোখে মুখে বলতে চাইছে, তোমার সব দুষ্টুমি ধরে ফেলেছি।

শ্যাম কাছে আসে না, জানালার কাছ থেকেই বলে, কী করে বুঝলে!

কাছে এসো, আমাকে ছুঁতে দাও। তারপর দ্যাখো বলতে পারি কি না!

শ্যাম ধীরে ধীরে দু'পা এগোয়, হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, ছোঁও।

ইতুর হাত এগিয়ে আসতেই শ্যাম হাত সরিয়ে নিয়ে অন্যখানে রেখে বলে, ছোঁও।

আঃ শ্যাম! বলতে বলতে ইতু হাত বাড়ায়।

শ্যাম হাত সরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে বাড়িয়ে বলে, এবার ছোঁও।

কী হচ্ছে? বলে ঠোঁটে হাসি চেপে উঠবার উপক্রম করে ইতু।

উঠো না ইতু। শ্যাম এক পা এগিয়ে আসে, বলে, ছোঁও।

হাতের নাগালে শ্যামকে পেয়ে ইতু আবার বসে পড়ে, তারপর ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ শ্যামের শার্টটা ধরার চেষ্টা করে।

তড়িৎগতিতে লঘু পায়ে সরে যায় শ্যাম, হাসে, ধরবে? তারপর জানালার আরও কাছে সরে গিয়ে বলে, ধরো তো দেখি?

আঃ শ্যাম! কাছে এসো।

তুমি এসো ইতু। শ্যাম গা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তোমার ভয় কী শ্যাম! তুমি অনেক মেয়েকে ছুঁয়েছো। তুমি পাকা লম্পট।

শ্যাম মাথা নাড়ে, ঠিক।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় ইতু, ভয় কী শ্যাম।

ইতু কাছে আসে, তার কাঁধের দিকে হাত বাড়ায়। শ্যাম মৃদু হাসিমুখে আস্তে আস্তে নুইয়ে দেয় কঁধ। ইতু ফিসফিস করে বলে, ভয় কী শ্যাম! ভয় কী!

ইতুর হাত নরমভাবে কাঁধের ওপর নেমে আসছে, এক্ষুনি ছুঁয়ে ফেলবে তাকে, শ্যাম আরও নিচু হয়, তারপর পিছল গতিতে ইতুর হাতের তলা থেকে সরে যায় ঘরের মাঝখানে। ইতুর হাত খানিকটা শূন্য থেকে ধপ করে নেমে আসে, দু'টো কাচের চুড়ির ঝনাৎ শব্দ হয়। সে ঘুরে ভ্রূ কুঁচকে শ্যামের দিকে তাকায়।

ধরো তো দেখি! শ্যাম হাসে। ইতুর দিকে খেলার ছলে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, ছোঁও তো দেখি!

কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থেকে হঠাৎ মৃদু হাসে ইতু। বলে, তুমি খেলতে চাও?

শ্যাম মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

ঠিক আছে। ইতু পলকের মধ্যে তার শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে নেয়, ছুঁতে পারলে আমার জিত!

জিত!

শ্যাম দরজা বন্ধ করে দেয়।

মুখোমুখি দু' জন একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ইতুর শরীর ভারী হয়ে গেছে অনেক। কোমরে আঁচল জড়ানোর পর এখন দেখা যাচ্ছে তার তলপেটে চর্বির একটু ঢিবি। হাতে গলায় মাংসের খাঁজ। তবুশ্যাম জানে, ইতু নাচ শিখত। তাই সে সতর্ক হয়।

ইতু সোজা এগোয় না, হালকা পায়ে দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে ঘুরে আসতে থাকে। হাসে। শ্যাম চটুল পায়ে উলটো দিকে ঘুরে যায়, বলে, বা আপ, ইতু।

ইতু হাসে। ঘুরতে থাকে। শ্যাম ঘুরতে থাকে। ঘরের সবকিছুই শ্যামের চেনা। দরজার দিকে গেলে তার ডান ধারে চৌকি, মাঝখানে চেয়ার, বাঁ ধারে স্টোভ জ্বলছে। জানালার দিকে গেলে ঠিক উলটো। এক ধারে তূপ হয়ে থাকা বই। একটা মোটা বই মেঝের ভিতরে এগিয়ে আছে। শ্যাম বইটা পেরিয়ে যায়, চৌকির পাশ দিয়ে মন্থর গতিতে সরে যায়, চেয়ারটায় একবার হাত রাখে। ডান ধারে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ থেমে বিদ্যুৎগতিতে সোজা এগিয়ে আসে। সাপের ছোবলের মতো তার হাত ছুটে আসে শ্যামের বুকের দিকে। অল্পের জন্য এড়িয়ে যায় শ্যাম, লাফিয়ে উঠে যায় চৌকিতে, দরজার দিকে লাফ দিয়ে নামে। হাসে। বাঁ দিকে ঘুরতে থাকে। ইতু হাসে। বাঁ দিকে ঘুরতে থাকে।

ইতু দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ, এই, কী হচ্ছে ছেলেমানুষি!

শ্যাম দাঁড়ায়, দূর থেকে বলে, ছুঁতে পারলে তোমার জিত।

আমি জিত চাই না। তুমি কাছে এসো।

খেলার নিয়ম ভেঙো না ইতু। শ্যাম বলে, খেলে জেতো।

ইতু বিছানায় বসে পা নাচায়, আচ্ছা, ছুঁতে চাই না তোমাকে।

শ্যাম দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ইতু ঠোঁট টিপে হাসে, অন্য দিকে চোখ রাখে, তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে এগিয়ে আসে। শ্যাম চমকে সরে যেতে গিয়ে কষ্টে স্টোভটার ওপর পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচায়। জানালার চৌকাঠে ভর দিয়ে সরে যায়, বলে, আঃ ইতু, তোমার বুদ্ধি বেড়ে গেছে। তোমার উন্নতির আর দেরি নেই।

সিগারেটটা পড়ে গিয়েছিল মুখ থেকে, ইতু সেই জ্বলন্ত সিগারেট তুলে নিয়ে তার দিকে ছুড়ে মারে। বিছানায় পড়লে শ্যাম সেটাকে তুলে নিয়ে বলে, থ্যাঙ্ক ইউ।

ইতু বেপরোয়াভাবে চেয়াবটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, কপালের ওপর থেকে কুঁচো চুল সরায়, সোজা এগিয়ে আসে। শ্যাম নিচু হয়ে তার পাশ দিয়ে, খুব কাছে দিয়ে উলটো দিকে চলে যায়, বলে, ঠান্ডা মাথায় খেলো, রেগে গেলে শুধু ঘুরে মরতে হবে।

ইতু সে-কথা শোনে না। সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করে। অন্ধের মতো সে পর পর চেয়ার চৌকি এবং দেয়ালে ধাক্কা খায়, মেঝের মোটা বইটাতে হোঁচট খেয়ে সামলে যায়। রাগে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপে। তার মুখ লাল হয়ে আসে, মুখে ঘাম চিকমিক করে ওঠে।

অল্প একটু উত্তেজনা বোধ করে শ্যাম। খেলা তাকে পেয়ে বসে। হালকা গলায় সে বলে, খেলো ইতু, খেলো। তোমাকে এখন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

বিছানার কাছে ইতু একটু থেমে যায়। হাত-ব্যাগটা তুলে নিয়ে ছুড়ে মারে শ্যামের দিকে। শ্যাম মাথা নিচু করলে সেটা দেয়ালে লাগে, তারপর সোজা নেমে এসে স্টোভের ওপর থেকে কেটলিটা উলটে দেয়। দপ করে স্টোভের আগুন ওপরে ওঠে, কেটলির জল মেঝে ভাসিয়ে দিতে থাকে। শ্যাম তার চেনা ঘরের নিরাপদ কোণে সরে যায়।

ইতু একটানে চেয়ারটাকে সরিয়ে দেয়, মেঝের গরম জল লাফ দিয়ে পার হতে যায়। পুরো টাল সামলাতে পারে না। দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে হাঁফায়, বলে, শ্যাম, আমাকে আর কষ্ট দিয়ো না।

ইতুকে হঠাৎ খুব বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। কোমরের আঁচল খুলে স্টোভের ওপর ঝুলছে।

শ্যাম বলে, থেমো না ইতু, খেলো৷ খেলে যাও। তারপর হাত বাড়িয়ে বলে, এই তো আমি। ছোঁও!

শ্যাম হাসে, দূরে সরে যায়, লাফ দিয়ে ওঠে চৌকির ওপর, এসো ইতু, খেলো,নইলে এক্ষুনি আবার আমি ঝিমিয়ে পড়ব।

ইতু তবু দাঁড়িয়ে থাকে, বলে, আমি আর পারছি না, শ্যাম।

পারবে। শ্যাম হাসে, ঠান্ডা হয়ে বসে থেকে কী লাভ! খেলো।

ইতু শ্লথ পায়ে এগোয়। শ্যাম সরে সরে যায়। তারপর চেয়ারটার চার দিকে তারা ঘুরপাক খায়। বড় বড় শ্বসের শব্দে ভরে ওঠে ঘর। তবু শ্যাম হাসে, ইতুকে থামতে দেয় না। ইতু প্রাণপণে চেষ্টা করে। শ্যাম ঘুরে ঘুরে চৌকির ওপর ওঠে, জানালার ধারে চলে যায়, দেয়ালের দিকে সরে আসে, গরম জলের স্রোত লাফিয়ে পার হয়। লক্ষ করে, ইতু দু'হাত বাড়িয়ে অন্ধের মতো ঘুরছে, শ্যাম যেদিকে তার উলটো দিকে যাচ্ছে। শ্যাম শিস দিয়ে জানিয়ে দেয় সে কোন দিকে আছে।

শ্যাম হাসে, শ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করে বলে, খেলো ইতু, খেলো। তোমাকে একটু ভাল লাগতে দাও। আমার শরীর গরম হচ্ছে না ইতু, বহুকাল ধরে আমি ঠান্ডা হয়ে আছি। খেলো ইতু, খেলে আমাকে ছোঁও। তারপর তোমার জিত।... আঃ ইতু, তুমি মোটা হয়ে গেছ একটু, পেটে চর্বি জমছে, বয়সও হয়ে এল। সময় থাকতে থাকতে খেলে নাও... বুড়ো হয়ে যাওয়ার আগে খেলে নাও... মরে যাওয়ার আগে খেলে নাও...সবকিছু সহজে পেতে নেই, পাওয়া উচিত নয়... এতকাল তোমাকে বড় সহজেই পেয়ে যেতুম, তাই তুমি আমাকে সবচেয়ে কম লাভবান করেছ।... আঃ হাঃ ইতু, ওদিকে নয়, আমি জানালার কাছে সরে এসেছি... আঃ ইতু, পড়ে যেয়ো না, খেলা মাটি হবে...অত সহজে হাল ছেড়ে দিয়ো না... থেমো না... থামলেই তুমি দুয়ো...থামলেই তুমি বুড়ো... থামলেই তুমি মাটির ঢেলা...ঘোরো, ঘুরতে থাকো... ঘুরতে ঘুরতে ছায়া হয়ে যাও ইতু,... মায়াবিনী হয়ে যাও... রহস্যময়ি হয়ে যাও... দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাও... আমি যেন ভিখিরির মতো তোমাকে কামনা করি... আমি যেন হাঁটু গেড়ে বসি তোমার জন্য... আমি যেন তোমার জন্য পাগল হতে পারি... আঃ হাঃ ইতু, তুমি স্টোভের বড় কাছে গেছ... ধীর হয়ে গেছে তোমার পা... আবার তোমার আঁচল খুলে দুলছে আগুনের ওপর... ওঃ ইতু!

বড় হতাশ হয় শ্যাম। থেমে যায়। দাঁড়িয়ে দেখে, ইতুর আঁচল দপ করে জ্বলে উঠল।

ওঃ শ্যাম। হাঁফাতে হাফাতে কেঁদে ওঠে ইতু, আমি কী করব শ্যাম!

ইতু তার আঁচল আলগা করে ধরে শ্যামের দিকে আসতে থাকে। শ্যাম সরে যায়।

ওঃ শ্যাম!

শ্যাম মাথা নাড়ে, আমি খেলার নিয়ম ভাঙি না ইতু।

কী করব শ্যাম!

শ্যাম বিছানা থেকে লেপটা তুলে নিয়ে ছুড়ে দিয়ে বলে, এটা দিয়ে চাপা দাও।

ইতু মেঝেতে উবু হয়ে বসে। লেপ চাপা দিয়ে আগুন নেভায়। আঁচলটা সবে ধরেছিল, নেভাতে কষ্ট হয় না। শ্যাম দূরে দাঁড়িয়ে দেখে।

ধীরে ধীরে মুখ তোলে ইতু। শূন্য চোখে চেয়ে থাকে। তারপর পোড়া আঁচল কুড়িয়ে নিয়ে শ্যামের বিছানায় এসে বসে। হাঁফায়।

ব্যাগটা তুলে নিয়ে বিছানায় ছুড়ে দেয় শ্যাম। ইতু চমকে ওঠে। তারপর যেন ঘুম এবং স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় ইতু। দরজার কাছে গিয়ে একটু থামে, বলে, তোমার বিছানাটা স্যাঁতস্যাঁতে শ্যাম, রোদে দিয়ে।

শ্যাম মাথা নাড়ে, আচ্ছা।

তুমি অনেক দিন দাড়ি কামাওনি।

শ্যাম মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ।

শ্যাম হাসে, হ্যাঁ।

চলি শ্যাম।

আচ্ছা।

শ্যাম দেখে, ছোট্ট প্যাসেজটা পার হয়ে সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছে ইতু। পিঠে পোড়া আঁচল। একবার তার ইচ্ছে হয় ইতুকে ডেকে বলে, কাপড়টা ফিরিয়ে পরে যাও। পরমুহূর্তেই ভাবে, থাক। কেননা তার মনে হয়, ইতুকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

৩. আপনি খেলোয়াড় ছিলেন

আপনি খেলোয়াড় ছিলেন?

হ্যাঁ।

কী খেলতেন আপনি?

চেয়ারে সামান্য শব্দ করে উঠে দাঁড়ায় শ্যাম, ব্যাগাটেলি আর ক্যারাম।

লোকটা তাড়াতাড়ি নিজের চশমায় হাত দিয়ে টেবিলের কাগজপত্রের দিকে তাকায়, কই! এখানে লিখেছেন ক্রিকেট আর ফুটবল।

শ্যাম টেবিলের ওপর ঝুঁকে বলে, দেন হোয়াই ডু ইউ আসক!

লোকটা অবাক চোখে শ্যামকে একটু দেখে নিয়ে বলে, ওঃ! আচ্ছা, আপনি বসুন।

শ্যাম আবার বসে পড়ে। তার গাল গলা ভয়ংকর চুলকোচ্ছিল, অনেক দিন পর গালে ক্ষুর পড়ায় দাড়ির গোড়া ফুলে উঠেছে। সে গালে হাত বোলাতে থাকে। লম্বা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে তিনজন। এ পাশে শ্যাম একা। দু'ধারে দু'জনের দিকে তাকায় না শ্যাম। মাঝখানে তার মুখোমুখি অল্পবয়সি যে লোকটা বসে আছে তার দিকেই চেয়ে থাকে। লোকটা কাগজপত্র থেকে আবার মুখ তোলে এবং প্রশ্ন করে, কভার পয়েন্টটা কোন অঞ্চল তা ডায়াগ্রাম না দেখিয়ে শুধু মুখে বুঝিয়ে দিন তো!

শ্যাম টেবিলের নীচে সামান্য পা নাচায়; নির্বিকারভাবে বলে, ভুলে গেছি।

লোকটা আবার মুখ খোলে, কথা বেরোবার আগেই শ্যাম তাড়াতাড়ি বলে, আমি সিভিল ড্রাফটসম্যান, আমার খেলা দিয়ে আপনারা কী করবেন?

লোকটা হতাশভাবে চেয়ারের পিছনে ঠেস দেয়, মুখের ওপর আড়াআড়িভাবে তুলে ধরে একটা পেনসিল, তারপর চিন্তান্বিতভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে।

এইবার ডান দিক থেকে ইংরিজিতে প্রশ্ন আসে, হু ইজ ডিন রাস্ক?

শ্যাম এতক্ষণে দেখে লোকটাকে। আধবুড়ো, মাথায় টাক, মোটা গোঁফ আর ঠান্ডা কূটনৈতিক হাসি তার মুখে।

শ্যাম মাথা ঠান্ডা রেখে বলে, আমি রিপোর্টার নই। তারপর কোলে রাখা ড্রইংয়ের ফাইলটা তুলে টেবিলে রাখে, তোমরা আমার ড্রইং দেখেছ।

লোকটা তেমনি ঠান্ডা হাসি হাসে, আমরা একজন আপ-টু-ডেট লোক চাই, শুধু ড্রাফটসম্যান নয়। তোমার কাগজপত্রে লেখা আছে সেইন্ট অ্যান্ড মিলারে তুমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চাকরি করতে, ড্রাফটম্যানের নয়। প্রশ্নের উত্তর দাও।

শ্যাম দ্রুত চিন্তা করে যায়। কিছুই মনে পড়ে না তার। মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করে ওঠে। তবু সে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বেপরোয়াভাবে বলে, তিনজন ডিন রাস্ক আছে। কোনজনের কথা জিজ্ঞেস করছ?

লোকটা সামান্য থমকে গিয়ে বলে, বাকি দুজন কে?

শ্যাম চোখ বুজে আন্দাজে বানিয়ে বলে, একজন নিউজিল্যান্ডের ভলিবল খেলোয়াড়, অন্যজন অস্ট্রেলিয়ান কেমিস্ট।

লোকটা সামান্য দুলে ওঠে, অ্যান্ড দি থার্ড ওয়ান?

অসহায়ভাবে লোকটার দিকে চেয়ে থাকে শ্যাম, তারপর আস্তে আস্তে বলে, আমি জানি না। দি থার্ড ওয়ান মাস্ট বি আনইম্পর্ট্যান্ট।

কিন্তু তুমিই বলেছ তিনজন আছে। সুতরাং আর-একজন কে তা তোমার জানা উচিত। কিন্তু তুমি জানো না।

শ্যাম মাথা নাড়ে, না। তারপর আস্তে আস্তে বলে, ডিন রাস্ক নামে কেউ আছে কি না আমি জানি না, যেমন ডিন রাস্কও জানেন না শ্যাম চক্রবর্তী বলে কেউ আছে কি না। ইট ইজ মিউঁচুয়্যাল ইগনোর‍্যান্স স্যার!

তারপর আর কোনও শব্দ হয় না। অনেকক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়। শ্যাম তিনজনকেই নীরবে লক্ষ করে। বাঁ দিকে কালো রোগা মাঝবয়সি মাদ্রাজি ভদ্রলোক বোধহয় কম দামি অফিসার, সারাক্ষণ লোকটি তার ওপরওয়ালাদের সামনে মাথা নিচু করে আছে, একটিও কথা বলেনি। সামনে মুখোমুখি বসা অল্পবয়সি বাঙালি লোকটি ছটফটে, অহংকারী, খুব তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে যেতে চায়। অনেকটা তার মতো। ডান দিকের আধবুড়ো লোকটিই সবচেয়ে শান্ত। মুখে হাসি, তবু পাথরের মতো অনড় মুখ, একটিও পেশি নড়ে না। বোঝা যায় না কোন দেশি লোক। আস্তে আস্তে শ্যামের হাই উঠতে থাকে, শরীর এলিয়ে আসে। শ্যাম জানে এরা কুকুরের মতো সতর্ক, খরগোশের মতো উৎকর্ণ লোক পছন্দ করে। তবু সে সাবধান হয় না। মাথা এলিয়ে দেয় চেয়ারের পেছনে, হাই তোলে, চোখ রগড়ায়।

মুখোমুখি বসা লোটা হঠাৎ মুখ তুলে বলে, আচ্ছা, আপনি আসতে পারেন।

শ্যাম ধীরে সুস্থে ওঠে, দরজার দিকে এগোয়। তারপর মাঝপথে সে দাঁড়িয়ে পড়ে দরজাটা ডান দিকে সরে গেছে। একটু ইতস্তত করে শ্যাম, তারপর ডান দিকে ঘুরে এগোতে চেষ্টা করে। তারপরই বুঝতে পারে বৃথা চেষ্টা, দরজাটা চক্রাকারে ধীরে ধীরে বাঁ দিকে সরে যাচ্ছে। বড় অদ্ভুত। সে আবার দাঁড়ায়। তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে চোখ বুজে কয়েক পা হাঁটে। চোখ খুলে দেখে সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার মুখোমুখি সে দাঁড়িয়ে আছে। ও-পাশের তিনজন সকৌতুকে তাকে দেখছে। সামান্য লজ্জা বোধ করে শ্যাম। তিনজনের দিকে চেয়ে একটু হেসে অনাবশ্যক কথা বলে, আমার ড্রইং আপনারা দেখেছেন, আমার কাগজপত্রও, আমাকেও। এখন জিজ্ঞেস করি এ-চাকরিটা কি আমার

হতে পারে? বলতে বলতে সে এক-পা এক-পা করে পিছু হটে যায়। মাঝখানের আর বাঁ দিকের লোক দু'জন কথা বলে না, সম্ভবত তার অবস্থা দেখে অস্বস্তি বোধ করে চোখ সরিয়ে নেয়। ডান দিকের আধবুড়ো লোকটা স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, শান্ত গলায় বলে, সাইকোলজিক্যালি ইউ আর আনফিট ফর দি জব।

পিছনে হাত বাড়িয়ে শ্যাম দরজার গোল হাতলটা হাতে পায়, তারপর 'ইয়াঃ বলে হেসে ওঠে। ইচ্ছে করে এগিয়ে গিয়ে সে লোকটার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, আমি জানতুম তুমিই এদের মধ্যে সবচেয়ে পাকা। আমি হলে তোমাকেই নিয়ে নিতুম আমার কোম্পানিতে।

ঝট করে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে শ্যাম। রুমালে মুখ মোছে। খোলা বারান্দায় একটু দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আস্তে দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে শ্যাম। এবার তার দিক ঠিক থাকে, পা ফেলতে গোলমাল হয় না। বস্তুত চাকরিটা হল না বলে সে খুব স্বস্তি বোধ করতে থাকে, তার চোখেমুখে হাওয়া লাগে।

বস্তুত সে বুঝতে পারে, তার আর কিছুই করবার নেই।

৪. একত্রিশের জন্মদিন পার হয়ে যাচ্ছিল

তেইশে ডিসেম্বর শ্যাম তার একত্রিশের জন্মদিন পার হয়ে যাচ্ছিল। সকালবেলায় ঘুম ভাঙতেই তার খেয়াল হয়েছিল—আজ আমার জন্মদিন। তখনও বিছানা ছাড়েনি শ্যাম, চোখে আধো ঘুম, লেপের ওম-এর ভিতর থেকে সে অনেকবার গুনগুন করল, আহা! আজ আমার জন্মদিন। এতকাল সে জন্মদিনকে হিসেবের মধ্যে আনত না, তার ধারণা ছিল ওতে স্পিড কমে যায়। ধরো, তুমি সিঁড়ি ভেঙে উঠছ কিংবা নামছ, লিফটের দরজা খুলতে বা বন্ধ করতে বাড়িয়েছ হাত, জুতোর ফিতে খুলতে বা বাঁধতে যাচ্ছ, চুমু খেতে বাড়িয়েছ ঠোঁট, দাড়ি কাটতে গিয়ে হয়তো মাত্র জুলপির নীচে বসিয়েছ ক্ষুর অমনি বয়স হয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়লে আস্তে শিথিল হয়ে যায় হাত-পা, মন এলিয়ে পড়ে, হাই উঠতে থাকে। অনাবশ্যকভাবে মনে হয় কী হবে আর এইসব করে? কিছুই তো আর থাকে না শেষ পর্যন্ত। শ্যামের জন্মদিনে তাই কোনও বছরেই কোনও উৎসব নেই, তেইশে ডিসেম্বরের কথা তার। খেয়ালই থাকে না।

রোজকার চেয়ে একটু দেরি করে বিছানা ছাড়ল শ্যাম। হাতমুখ ধুয়ে আয়নায় মুখ দেখে শ্যাম। আজকাল তাকে অনেকটা সাধু-সন্তের মতো দেখায়। চুল বেড়ে গিয়ে ঘাড়ের কাছে বাবরির পাক খেতে শুরু করেছে। আয়না হাতে শ্যাম এসে জানালায় দাঁড়াল। দক্ষিণের জানালায় রোদ পড়ে আছে। সামনেই একটা আমগাছ কয়েকটা পাতার ছায়ায় একটা মাকড়সার জালে এখনও শিশিরের জল আটকে আছে। তার হাতের আয়না থেকে রোদ ঠিকরে জালটার ওপর পড়তেই শ্যাম আয়না ঘুরিয়ে নিল। তড়িৎগতিতে আলোটা গিয়ে পড়ল উলটো দিকের বাড়ির তিনতলার একটা জানালায়। সামান্য কৌতুহল নিয়ে তাকিয়ে দেখল শ্যাম—একটা অয়েল পেইন্টিঙের ওপর পড়েছে আলোটা-বুড়ো একটি মুখ, ঠোঁটে সকৌতুক হাসি। ভ্রূ কুঁচকে শ্যাম আপনমনে বলল, ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার! তারপর আলো ঘুরিয়ে নিল। লাল দরজাওলা একটা গ্যারেজের সামনে ডাস্টবিনের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে তিনটে কুকুরছানা, তাদের ওপর আলো ফেলল শ্যাম। কিন্তু খোলা রাস্তায়

যথেষ্ট রোদ রয়েছে, তাই আলোটা জমল না। সে একটু ঝুঁকে ছায়া খুঁজতে থাকে। ছেলেবেলায় আলো-ফেলার খেলা অনেক খেলেছে শ্যাম। এখন বয়স হয়ে গেছে। আজ একত্রিশ পেরিয়ে যাচ্ছে সে। ভেবে সামান্য হাসল শ্যাম। যেমন হাসি ছিল তার ক্লাস সিক্সে বা সেভেনে। গলা বাড়িয়ে দেখল বাঁ দিকের মোড় পেরিয়ে শ্লথগতিতে আসছে রিকশা, তাতে গিটার হাতে একটি মেয়ে। সতর্ক হাতে আয়না সামনে নিল শ্যাম। কে জানে আলো ফেললে মেয়েটা রিকশা থামিয়ে দোতলায় উঠে আসবে কি না, লাজুক হেসে বলবে কি না– ডাকছিলেন, তাই এলুম! শ্যাম জাফরানি শাড়ি পরা, ব্যাগ হাতে আর-একটি মেয়েকেও ছেড়ে দিল মেয়েটা অনেক দূর পর্যন্ত সোজা হেঁটে চলে গেল। শ্যাম আলোটাকে কয়েকবার দত্তবাড়ির দেয়ালে নাচিয়ে দিল, দেয়াল-ঘেরা লন–তাতে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে কাক, সিঁড়ির নীচের ফুটো থেকে বেরিয়ে এসে একটা সাদা বেড়াল ডন দিচ্ছে। বেড়ালের মুখে শ্যাম আলো ফেলল, কোনও ফল হল না, মুখ ঘুরিয়ে রাজরানির মতো অবহেলায় বেড়ালটা সিঁড়ি ভেঙে দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। শ্যাম আলো ঘুরিয়ে দিতে একটা কাক উড়ে গেল। লনের ও-পাশে দূরের একটা বাড়ির জানালায় অসাবধানে আলো পড়তেই চিকমিক করে উঠল কয়েকটা সাজিয়ে রাখা পেয়ালা পিরিচ। শ্যাম আলো ফেলতে ফেলতে ক্রমে আলোটার নড়াচড়ার ওপর কর্তৃত্ব খুঁজে পাচ্ছিল। মিত্তিরদের বুড়ো বাপ বাজার করে ফিরছে, পিছনে চাকর–শ্যাম দু'জনকেই ছেড়ে দেয়। খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে একটা ট্যাক্সি–জানালায় একটা অবাঙালি বাচ্চা ছেলে, শ্যাম ঝট করে তার মুখে ফেলে আলো, তারপর ট্যাক্সির গতির সঙ্গে তাল রেখে আলোটা স্থির রাখে একটুক্ষণ। বাচ্চাটা তার দিকে তাকায়, হাতে চোখ আড়াল করে, খানিকটা দূরে গিয়ে হঠাৎ জিভ ভেঙিয়ে চলে যায়। তারপর আলো ফেলতে তার ক্লান্তি লাগে। সে একটা গোরু, একটা বুড়ি আর একটা সিনেমার পোস্টারে নায়িকার মুখে পর পর আলো ফেলে। তারপর আয়নাটা। রেখে দেওয়ার জন্য ঘরের ভিতরে চলে আসছিল শ্যাম। ঠিক এ-সময়ে সে শুনতে পেল একটা মোটর-সাইকেলের আওয়াজ, ডান দিকের মোড়ের ওপাশ থেকে আসছে। দ্রুত তার হাত-পায়ের পেশি শক্ত হয়ে ওঠে। অনেক দিন ধরে সেই কবে থেকে যেন মোটর সাইক্লিস্টদের ওপর একটা পোষা রাগ আছে তার। দ্রুত জানালার কাছে

ঘুরে আসে সে। মোটরসাইকেলটা এক্ষুনি মোড়ে এসে বাঁক নেবে– মোড়টা তেমাথা। শ্যাম লক্ষ করে, বড় রাস্তার ওপর একটা গোরু ধীরে রাস্তা পার হচ্ছে। মোড়ের থেকে মোটর সাইকেলের মুখ আর লোকটার কালো মাথা দেখা যেতেইশ্যামের আয়নার আলো ঠিকরে পড়ল মুখে-ঠিক মুখে। ঝড়ের মতো শব্দ তুলে বাঁক নিচ্ছিল মোটরসাইকেল, শ্যাম এক পলকের জন্য দেখল লোকটা তার আলো থেকে মাথা সরিয়ে নিতে গিয়ে কাত হল। তারপর আর কিছু দেখার ছিল না, শুধু গোরুটার ভয়ংকর লাফিয়ে ওঠা ছাড়া। তড়িৎগতিতে শ্যাম মেঝেতে বসে পড়ল, শুনতে পেল রাস্তার ওপর মোটর সাইকেলটার আছড়ে পড়ার ধাতব কঠিন শব্দ। সে হামাগুড়ি দিয়ে জানালার কাছ থেকে ঘরের মধ্যে চলে এল। আয়নাটা বিছানায় ছুড়ে দিয়ে দ্রুত দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তার ভিড়টাকে এড়িয়ে গেল সে। লোকজন জড়ো হচ্ছিল দ্রুত। শ্যাম তাদের পাড়া ছাড়িয়ে গেল। খুব সুন্দর রোদ আজ, তেমন খুব শীতও। খুঁজেপেতে সে একটা নিরিবিলি চায়ের দোকান বের করল। খুবই ওঁছা দোকান। কোণের দিকে একটা জায়গা দখল করে বসে পড়ল। কেন যে মোটরসাইক্লিস্টদের ওপর একটা পোষা রাগ আছে তার– তা ঠিক মনে পড়ছিল না শ্যামের। মনে করতে গিয়ে মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করে উঠল। মেঝেয় গড়াচ্ছিল খবরের কাগজ। সে নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল। অনেক দিন খবরের কাগজ পড়া হয় না। অন্যমনস্ক থাকার জন্যে সে খবরের কাগজে মাথা গুঁজে দিল। দিয়েই দেখল খেলার পাতা। একজন খেলোয়াড় কাল থেকে আটানব্বই রানে নট আউট আছে। বেচারা! সারারাত নিশ্চিত ওর ঘুম হয়নি!কম রানে আউট হয়ে গেলে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারত। তবু আরও দুই রান, মাত্র আর দুটো ভয়ংকর বিভীষিকার মতো রান– বাইশ আর বাইশ চুয়াল্লিশ গজ মাত্র! শ্যামের ইচ্ছে হল লোকটার জন্য এক্ষুনি চুয়াল্লিশ গজ একটা ছুট দিয়ে আসে। অতটুকুর জন্য সারারাত না-ঘুমোনো, খাওয়ার অনিচ্ছা, মহিলার প্রতি শীতল আচরণ–সবই সম্ভব। বেচারা লোকটা! ওই দুটো রান না হলে...! না হলে কী যে হবে ভেবে শ্যাম খুবই অসহায়ভাবে চার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। মনে হল দৈব ছাড়া কোনও উপায় নেই। ওই দুটো রান যে হবেই কোনও মানুষ তা নিশ্চিত করে বলতে পারে না। ভাবতে ভাবতে সামান্য অস্থির বোধ করে শাম। সে খবরের কাগজটা ফেলে

দিয়ে উঠে পড়ে। দাম দিয়ে দেয়। তারপর খোলা রাস্তায় রোদ আর বাতাসের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। এলোমেলো হেঁটে যায় এ রাস্তা থেকে ও-রাস্তা।

তারপর দুপুরবেলা সে তার পাইস হোটেলে নিজের সম্মানে নিজেকেই একটা ভোজ দিল। মাংসের হাড় ভাঙল মড় মড় করে, দই খেল চেটেপুটে। সুবোধ মিত্র সকাল ন'টায় খেয়ে অফিসে যায়। দেখা হল না। কিন্তু ভেবে রাখল শ্যাম, রাত্রে দেখা হলে মিত্রকে সে খাইয়ে দেবে। আজ মৌরি নিল না শ্যাম, বাইরে এসে দোকান থেকে পান খেল একটা, আর কিনে নিল খুব দামি এক প্যাকেট সিগারেট। ভিখিরিদের দেওয়ার জন্য পুরো একটি আধুলি খুচরো করে নিয়ে পকেটে রাখল। বস্তুত এখন মাসের শেষ, কিন্তু তার কোনও চিন্তাই নেই। ব্যাঙ্কে এখনও আড়াই হাজারের মতো মজুত আছে। ইচ্ছে করলে মাসের যে-কোনও দিনকে মাস পয়লার বিকেলের মতো সুসময় করে তোলা যায়। একত্রিশের জন্মদিনে নিজেকে স্বাধীন বলে মনে হচ্ছিল তার। তার এমনও মনে হচ্ছিল যে, আজকের দিনটা বোধহয় ভালই কেটে যাবে। পরমুহূর্তেই মনে মনে নিজেকে শাসন করল সে। ভবিষ্যৎ-চিন্তাই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় অন্তরায়। অতীত চিন্তাও। কাজেই সে সকালের কথা ভুলে গেল, বিকেলের কথাও আর ভাবল না। খর রোদ আর উত্তরে বাতাসের চমৎকার এই দুপুরের মধ্যেই মজে গেল তার মন। খ্রিসমাসের আর দেরি নেই। দোকানে লাল শালুতে লেখা 'হ্যাপি খ্রিসমাস'। শো কেসে সাজানো কেক, তুলা দিয়ে তৈরি তুষারক্ষেত্র আর বুড়ো সান্টা ক্লস। সামনেই একটা রুটির ভান, পিছনের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায় মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত খোপে খোপে সাজানো রুটি। হঠাৎ মনে হয় পৃথিবীতে বড় সুসময় এসে গেছে। এবার বোধহয় মাঠে মাঠে ফসল ফলেছে খুব, চাষাদের গৃহিণীরা হয়েছে সন্তানবতী। সরকারি বিজ্ঞপ্তি চলে গেছে গ্রামে গ্রামে, আরও সন্তান উৎপাদন করো গো মা-জননীরা। জমিন পতিত রেখো না গো বাপ-সকল, সুসন্তানে ভরে দাও দেশ। আমাদের কারখানায় বাড়ছে উৎপাদন, আমাদের কৃষিতে বাড়ছে উৎপাদন, আমাদের খনিতে বাড়ছে উৎপাদন। এত ভোগ করার লোক কই গো? খাওয়ার লোক নেই বলে আমরা ইলিশের ঝাককে সমুদ্রে চলে যেতে দিলুম, বাছুরে খেয়ে শেষ করতে পারে না বলে আমাদের দুগ্ধবতী গোরুগুলির বাঁট ফুলে দুধ খসে পড়ছে

মাটিতে, ভরভরন্ত পাকা ফসলের ক্ষেতে আমরা ছেড়ে দিয়েছি মোষের পাল, আবাদের মৌচাক থেকে চুইয়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মধু। মা-জননীরা লোকজনে ভরে দাও দেশ। সুসন্তান দাও গো, বাপ-সকল! মুখে সামান্য হাসি, গায়ে শীতের স্বাস্থ্যকর রোদ আর ভরা পেটে শ্যাম আস্তে আস্তে হাঁটছিল। অতীতের কোনও মুখ মনে পড়ে না, ভবিষ্যতের কোনও চিন্তা মনে আসে না। বড় তৃপ্ত এবং স্নিগ্ধ লাগছিল নিজেকে। ফুটপাথে ডাকবাক্সের পিছনে ছেড়া কাথার সংসার থেকে একটা ভিখিরির ছানা হামা দিয়ে ফুটপাথের মাঝামাঝি চলে এসেছে। শ্যাম এক লাফে তাকে ডিঙিয়ে গেল। একজন হকার ধীর-গম্ভীর স্বরে তাকে উদ্দেশ করে হাকল, "গেঞ্জি...! ভীষণ চমকে উঠল শ্যাম। তারপর দ্রুত পেরিয়ে গেল গেঞ্জিওয়ালাকে। আর-একটু হলেই অতীতের কথা মনে পড়ে যেত। সে সামনেই মোড়ের মাথায় বাঁক নিল। ফাঁকা রাস্তা। ঢিমেতালে ক্লান্ত একটি লোক ঠেলাগাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। শ্যাম টপ করে চোখ বুজে ফেলে। অমনি চোখের ওপর ছবি ফুটে ওঠে। সারি সারি সব দোকান, সৎ দোকানিরা পবিত্র চোখ নিয়ে বসে আছে। শালীন ও সুন্দরী যুবতীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়, শান্ত ও সুন্দর শিশুরা হেঁটে যাচ্ছে, নির্লোভ, বিনয়ি ও স্বাস্থ্যবান যুবা পুরুষ দ্রুত চলেছে কাজে, কর্মঠ ও বিজ্ঞ বুড়োরা সকৌতুক চোখে বারান্দায় বা ব্যালকনিতে বসে কাটিয়ে দিচ্ছে সুন্দর অবসরের জীবন। সর্বত্রই অদৃশ্য বিজ্ঞাপন বেঁচে থাকুন। আপনার জীবন আমাদের কাছে মূল্যবান।

হাইড্র্যান্টের জলে শ্যামের ডান পা ছপ করে গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গেল। চোখ চেয়ে হাসল শ্যাম। সামান্য ক্লান্তি লাগছিল তার। অনভ্যাসের বেশি খাবার তার পাকস্থলীতে ডেলা পাকিয়ে উঠছে। তবু ঘরে ফিরতে ইচ্ছে হল না তার। হাঁটতে হাঁটতে সে আবার বড় রাস্তায় চলে এল। চৌরঙ্গির দিকে গেলে মন্দ হয় না, খ্রিসমাস ইভে ওই দিকটাই জমজমাট। বাসস্টপে ঘ্যানঘ্যান করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা নানা বয়সের ভিখিরি, কালো চশমাপরা এক মহিলা রুমালে মুখ চেপে চোখ ফিরিয়ে বাসের পথ চেয়ে আছে, রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে 'টেরিলিন'-পরা দুই হোকরা। বাস এসে গেল। সামান্য ভিড় ঠেলে নামা-ওঠার মধ্যে যে ধাক্কাধাক্কি তাতে গা ছেড়ে দিল শ্যাম। তারপর বাসের হাতল ধরার ঠিক আগের মুহূর্তে পকেটের যাবতীয় খুচরো পয়সা মুঠো করে তুলে ফেলে দিল রাস্তায়।

রিনরিন ঠিঠিন সেই শব্দ কয়েক মুহূর্তের জন্য রাস্তার অন্য শব্দকে ডুবিয়ে দিল। সেই শব্দের এত জোর যে চমকে উঠল আশপাশের লোকজন, নামতে বা উঠতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল অনেকে। হাসি চেপে শ্যাম দেখল ফুটবোর্ডের ওপর একজন বুড়ো বাসের হাতল ছেড়ে দিয়ে টাল খেতে খেতে ভীষণ সন্দেহে নিজের তিনটে পকেট হাতড়ে দেখছে। পয়সা! আরে! পয়সা পড়ল কার! এরকম একটা চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল; ভিড়ের মধ্যে পানকৌড়ির মতো ডুব দিল দুটো লোক। শ্যাম নিশ্চিন্তে উঠে গেল বাসে। কন্ডাক্টর ঘন্টির দড়ি টেনে রেখে দিল, তারপর একটু ইতস্তত করে দ্রুত বাজিয়ে দিল ঘণ্টি, চেঁচিয়ে বলল, "ঠিক আছে!' ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখল শ্যাম, বাস স্টপের ভিখিরিদের মধ্যে ছোটখাটো একটা দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। কিছু লোক জমে গেছে ইতিমধ্যেই। মুখ ফিরিয়ে শ্যাম বাসের ভিতরে ঢুকে যেতে লাগল। তারপর রড ধরে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে ফেলল। সামান্য ভাত-ঘুম পেয়ে বসছিল তাকে।

এলগিন রোড পেরিয়ে সে বসবার জায়গা পেল। থিয়েটার রোডের কাছাকাছি কন্ডাক্টর ভাড়া চাইলে পকেটে হাত দিয়ে সামান্য থমকে গেল শ্যাম। একটিও খুচরো পয়সা নেই। বুক-পকেটে দুটো দশ টাকার নোট। একটা বাড়িয়ে দিয়ে শ্যাম কন্ডাক্টরের দিকে তাকাল। ঝকড়া চুলওলা কর্কশ চেহারার লোক, মুখে শিরা-উপশিরা জেগে আছে। মাথা ঝাকিয়ে লোকটা বলল, খুচরো দিন। বাসটা একটা স্টপে ধরল! শ্যাম লোকটার চোখে স্থির চোখ রেখে বলল, নেই। কন্ডাক্টর হাতের টিকিটে 'টিরিক' করে করে আঙুল দিয়ে শব্দ তুলল, পিছনে তাকিয়ে পার্টনারকে পুরুষ গলায় বলল, বলবে ভাই! তারপর দ্রুত হাতে ঘণ্টির শব্দ তুলে শ্যামের দিকে চেয়ে বলল, খুচরো নেই? শ্যাম মাথা নাড়ে—নেই। আবার সেই হাতের টিকিটে 'টিরিক' শব্দ, বিরক্তিতে মাথা ঝাকায় লোকটা, নোটের ভাঙানি হবে না। শ্যাম স্থিরদৃষ্টিতে নোকটার দিকে চেয়ে থেকে বলে, তা হলে? লোকটা অবহেলায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, তা হলে আর কী! এমনিই চলুন। বলতে বলতে লোকটা ভিড়ের ভিতর ঢুকে যায়, নেপথ্য থেকে তার গলা শোনা যায়, অনেকবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে, বাসে বড় নোটের ভাঙানি পাওয়া যায় না। মুহূর্তেই চোখে-মুখে রক্ত ছুটে এল শ্যামের, রাগে আর অপমানে শরীর কেঁপে উঠল তার। ইচ্ছে হল লাফিয়ে উঠে

চিৎকার করে সবাইকে বলে, ভাইসব, একটু আগে গড়িয়াহাটার মোড়ে আমি মুঠো-ভরতি খুচরো পয়সা রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসেছি...। কিন্তু বস্তুত তা করল না শ্যাম। শান্তভাবে উঠে দাঁড়াল। কন্ডাক্টর পিছন ফিরে ওদিককার টিকিট নিচ্ছে, শ্যাম তার পিঠে খোঁচা দিয়ে বলল, আমি নেমে যাচ্ছি। লোকটা মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল, একটুও দুঃখিত না হয়ে বলল, আপনার ইচ্ছে। বাসসুদ্ধ লোক দেখছিল শ্যামকে। উকিলের মতো কালো পোশাকপরা বুড়ো একটা লোক শ্যামের রাস্তা আটকে বলল, দাঁড়ান, আমি দেখছি। আমার কাছে থাকতে পারে। বলেই লোকটা হাতের ফোলিও ব্যাগ এগিয়ে দেয় শ্যামের দিকে, এটা ধরুন। আমার ভিতরের পকেটে আছে কি না দেখি। শ্যাম বিনীতভাবে তার ব্যাগটা ধরল হাত বাড়িয়ে। লোকটা চলন্ত বাসে দোল খেতে খেতে তার গলাবন্ধ কোটের তিনটে বোতম খোলে, তারপর রহস্যময় অন্দরমহলে হাত চালিয়ে বের করে আনে একটা প্রকাণ্ড নোটবই। লোকটা পাছে পড়ে যায় সেই ভয়ে শ্যাম লোকটার কাধ চেপে ধরে রাখে, পিছন থেকে একজন দয়ালু হিন্দুস্থানিও লোকটার পিঠে নিজের কাঁধ ঠেকা দেয়। লোকটা তার নোটবই খুলতেই একগাদা খুচরো কাগজ ঝরে পড়ে। আহাঃ' বলে বুড়ো তখন নিচু হয়ে কাগজ কুড়োয়, শ্যাম আর হিন্দুস্থানিটা তাকে ধরে রাখে। দাঁড়িয়ে এবার সতর্কভাবে অনেক কাগজপত্রের ভিতর থেকে টাকা বের করে লোকটা গুনে-গেঁথে শ্যামের হাতে দেয়। প্রথমে ফোলিও ব্যাগটা, তারপর দশ টাকার নোট তার হাতে দেয় শ্যাম, তারপর একটু কৃতজ্ঞতার হাসি হাসে, পরোপকার করতে পারায় বুড়োর মুখেও সামান্য হাসি দেখা দেয়। শ্যাম ধীরেসুস্থে ভিড় ঠেলে এগোতে থাকে, পিছন ফিরে আর তাকায় না। কন্ডাক্টরের কর্কশ গলা শোনা যায়, কী হল? ভাড়াটা—?'শ্যাম উত্তর দেয় না। ভাড়া দেওয়ার কোনও ইচ্ছেই সে বোধ করে না। তাই নিজেই ঘন্টির দড়ি টেনে বাস থামায় স্টপে, তারপর নামবার আগে নিজেই ছাড়বার ঘণ্টি দিয়ে দেয়, ময়দানের কাছে নেমে পড়ে। চলন্ত বাস থেকে সামান্য গোলমাল তার কানে আসে, সে কান ফিরিয়ে নেয়। হাসিমুখে মাঠের টলটলে রোদের মধ্যে নেমে যায়।

একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে অনির্দিষ্ট দিকে ছুড়ে মারে শ্যাম। ঘাসের ডাঁটি ছিঁড়ে নিয়ে চিবোয়, খুব ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে। সে কিছুতেই মনে করতে পারছিল না, কী কারণে,

কেন মোটর-সাইক্লিস্টদের ওপর তার একটা পুরনো, পোষা রাগ আছে। ভ্রূ সামান্য কুঁচকে ওঠে তার। পকেট হাতড়ে সে সিগারেটের প্যাকেট বের করে। পেটের ভিতরে গজিয়ে উঠেছে দুপুরের খাবার, তার সামান্য বুকজ্বালা। করে। দেশলাই জ্বালতে গিয়ে সে লক্ষ করল তার আঙুল অল্প অল্প কাপছে। গত কয়েক মাসে তার শরীর শুকিয়ে গেছে অনেক। এককালে প্রতি মাসের চার তারিখে ওজন নেওয়া তার বাতিক ছিল, তখন। দিনের মধ্যে কয়েকবারই তার নিজেকে রোগা কিংবা মোটা বলে মনে হত। বহুকাল ওজন নেওয়া হয়নি আর। তবু সে জানে ওজন অনেক কমে গেছে। অনেক দুশ্চিন্তা ও মেদ ঝরে গেছে তার।

খুশি মনেই শ্যাম মাঠের মধ্যে অনেক দূর হেঁটে যায়। এলোমেলো হাওয়ায় তার তেল-না-দেওয়া রুক্ষু চুল উড়ে আসে কপালের ওপর। আঙুল দিতেই চুলের জট টের পাওয়া যায়, চিরুনি বসালে চোখে জল আসে। শ্যাম সাদা পোশাক-পরা একদল ক্রিকেট খেলোয়াড়কে অন্যমনস্কভাবে পেরিয়ে গেল। পাতা-পোড়ানোর মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায় হঠাৎ। তারপর মাঠ-ভরা রোদ্দুরের ভিতরে সে ইচ্ছেমতো হাঁটতে থাকে, যেদিকে খুশি চলে যায়। বাঁ দিকে সাদা শূন্যতায় ধু-ধু করছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ডান ধারে বহুদূরে দেখা যায় হাঁটু মুড়ে গঙ্গার কোল জুড়ে আছে হাওড়ার পোল, ধ্বংসাবশেষ দুর্গের শেষ জীর্ণ স্তম্ভটির মতো বিবর্ণ নিঃসঙ্গ অক্টরলোনি মনুমেন্ট। তারপর একসময়ে তার আর দিক ঠিক থাকে না। সে স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে দেখে হাওড়ার পোল তার বাঁ দিকে চলে গেছে, ডান দিকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। আবার কয়েক পা হেঁটে সে ডাইনে বাঁয়ে কোনওটাকেই খুঁজে পায় না। কখনও সে সামনে পিছনে, কখনও বাঁয়ে ডাইনে, কখনও ডাইনে বাঁয়ে ওই দুটিকে দেখতে থাকে। মাঠের মধ্যে এত দূরে চলে এসেছে সে যে, দুরের রাস্তায় লোকজন প্রায় দেখাই যায় না। প্রকাণ্ড মাঠ ভূতগ্রস্তের মতো ঝিমঝিম করছে রোদে, হেঁড়া কাগজ উড়িয়ে নিয়ে খেলছে বাতাস, আর পাতা-পোড়ানোর মিষ্টি গন্ধ। তার শিরা-উপশিরায় রক্তের গতি ক্রমে ঝিমিয়ে আসছে সে টের পায়। সে কোনওক্রমে একটা গাছের ছায়ার দিকে হেঁটে যেতে থাকে। গাছটা কেবলই সরে যায় ডাইনে বাঁয়ে, দূরে সরে যায়। হাঁপিয়ে ওঠে শ্যাম। সামান্য অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ সে ব্যাপারটা

বুঝতে পারে না। তারপর আবার সে চেষ্টা করতে থাকে। গাছটার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, চোখ বুজে এবং চোখ খুলে সে গাছটার ছায়ায় পৌঁছুতে চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ লেগে যায়। এবং একসময়ে সে গাছটার কাছে পৌঁছে যায়। আপনমনে মৃদু কৃতিত্বের হাসি হাসে শ্যাম, তারপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। প্রকাণ্ড খোলা উদোম আকাশ হঠাৎ নেমে আসে তার চেতনার ওপর। ক্রমে চোখ থেকে আলো মুছে যায়। অসহায় শ্যাম হাত বাড়িয়ে চেপে ধরতে চায় ঘাস-মাটি, গাছের ছায়া, কিন্তু টের পায়, তার জাগরণের তটভূমি অতিক্রম করে আসছে ঘুমের ঢেউ। তাকে নিয়ে যেতে থাকে। শেষবারেব মতো এক ঝলক চেয়ে দেখে শ্যাম, হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো মনে হয় তার জাগরণ কিংবা ঘুম কোনওটাই তার ইচ্ছাধীন নয়। ভয়ংকর শক্তিমান কেউ তাকে তার ইচ্ছামতো চালিয়ে নিচ্ছে, কাঠি ছুঁইয়ে পাড়িয়ে দিচ্ছে ঘুম, কাঠি ছুঁইয়ে জাগাচ্ছে। এই রোদ, এই মাঠ, এই ঘাস কিংবা গাছের ছায়া, অথবা ওই ন্যাংটো উদোম আকাশের মধ্যেই কোথাও রয়েছে সে। শেষ চেষ্টায় সে খুঁজে দেখে প্রাণপণে, তারপর ধপ করে তার চেতনাহীন মাথা নরম ঘাস-মাটির মধ্যে ঘুমে ডুবে যায়।

মোটরসাইকেলের ভীষণ শব্দে চমকে ঘুম ভেঙে গেল শ্যামের। শিউরে উঠে বসল সে। তড়িৎগতিতে তাকিয়ে দেখল চার দিকে। তারপর ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল আওয়াজ। সে স্পষ্ট টের পেল শব্দটা আসছে তার মাথার ভিতর থেকে। সার্কাসে কিংবা শিয়ালদার রথের মেলায় জালে-ঘেরা গোল খাঁচার মধ্যে মৃত্যুকূপের সেই খেলায় যেভাবে মোটরসাইকেল ঘুরতে ঘুরতে ওঠে কিংবা নামে, চক্কর দেয়, ঠিক অবিকল সেই রকমভাবে একটা মোটরসাইকেল এতক্ষণ তার মাথার ভিতরে ঘুরপাক খেল। সে জেগে উঠতেই সেই শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গভীর নিস্তব্ধতার ভিতরে মিলিয়ে গেল। তারপর নিজের হৃৎপিণ্ডের ধক ধক শব্দ শুনতে পেল সে। কিছুক্ষণ সে ভীষণ বোকার মতো, গাড়লের মতো তার চতুর্দিকে অন্ধকার মাঠ, আর কুয়াশায় ভরা শূন্যতার দিকে চেয়ে রইল। মনে হয় নিশিরাতের পরি তাকে উড়িয়ে এনেছে, শুইয়ে দিয়ে গেছে এই মাঠের মধ্যে। তারা নিয়ে গেছে তার স্মৃতি, স্বপ্ন আর ভবিষ্যৎ-চিন্তা। এখন আর নিজের নাম মনে পড়ে না, পরিচয় মনে পড়ে না। হিম পড়ে ভিজে গেছে তার ধুতি আর চাদর, স্যাতস্যাত করছে স্যান্ডেল।

উত্তরের বাতাস লাগে হঠাৎ, হি-হি ঠান্ডায় সে কেঁপে ওঠে। হঠাৎ খেয়াল হয়, ডান হাতের মুঠোয় ধরা দশ টাকার ভাঙানো নোট। মনে পড়ে যায়, বাস-ভাড়া দেওয়া হয়নি। মনে পড়ে যায়, আজ তার একত্রিশের জন্মদিন। মনে পড়ে যায় যে, সে শ্যাম।

উঠে পড়ে শ্যাম। ধীরেসুস্থে অন্ধকার মাঠ পার হয়। ঘাসে হিম জমে আছে–শিশিরে ভিজে পায়ের পাতা থেকে কিলবিল করে শীত উঠে আসে শরীরে। বাস-রাস্তায় এসে সে বাস ধরল। সারা রাস্তায় সে কিছুতেই ভেবে পেল না, কেন সে ওই মাঠের মধ্যে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল! কেন সে বাসের ভাড়া দেয়নি! কেন সে খুচরো ছিটিয়ে দিয়েছিল রাস্তায়! কেন সে আয়নার আলো ফেলেছিল একজন মোটর-সাইক্লিস্টের মুখে।

৫. পাইস হোটেলের দরজায়

পাইস হোটেলের দরজায় সুবোধ মিত্রের সঙ্গে দেখা। মিত্র হইহই করে ওঠে, সাড়ে সাতটায় আপনি এখানে! আমি তো মাত্র বিকেলের থার্ড কাপ চা চালিয়ে গেলুম, দশটায় খেতে আসব। চলুন মশাই, বলে মিত্র শ্যামের হাত ধরে, এক্ষুনি রাতের খাওয়া শেষ করলে মাঝরাতে খিদে পাবে। চলুন–

এতক্ষণের শীতভাব কেটে যায় শ্যামের। শরীরের উত্তাপ ফিরে আসে। মনে পড়ে, সারা দিন সে কথা বলেছে খুব কম। হিসেব করে দেখল, সকাল থেকে সে কথা বলেছে মাত্র চারটি লোকের সঙ্গে প্রথম, চায়ের দোকানের বয়, তারপর হোটেলের ছোকরা চাকরকে মাংস আর দই দিতে বলেছিল, পানের দোকানদারের কাছে চেয়েছিল সিগারেট আর পান, কন্ডাক্টরকে বলেছিল খুচরো নেই, আর, আমি নেমে যাচ্ছি।

সে হেসে মিত্রকে বলল, নিয়ে চললেন কোথায়!

কাছেই আমার আস্তানা মশাই। চলুন, দেখে আসবেন।

অনুগতের মতো শ্যাম মিত্রর সঙ্গে হাঁটতে থাকে, কেননা, এখন যে-কোনও সঙ্গই তার কাছে প্রিয় বলে মনে হয়। সে মিত্রর দিকে চেয়ে দেখে, এবং পাশ থেকে মিত্রর প্রোফাইল দেখে তার এমন ধারণা হতে থাকে যে, মিত্রর বয়স খুব বেশি নাও হতে পারে।

যেতে যেতে মিত্র লন্ড্রি থেকে কাপড় নিল, মুদির দোকান থেকে নিল বাতাসা, ফুলের দোকান থেকে গ্যাদাফুল নিল কলাপাতায় মুড়ে। এ-সবের ফাঁকে ফাঁকে একটানা কথা বলে যাচ্ছিল মিত্র, আপনি মশাই ক্রিমিনাল! (শ্যামের শীত করে ওঠে।) আমি ভেবেছিলুম আপনি বেকার। আজ হোটেলের ম্যানেজারের কাছে শুনলুম, বেশ ভাল একটা চাকরি করতেন আপনি অফিসার। ডিরেক্টারের বদমাইসি ধরে দিয়েছিলেন বলে আপনার চাকরি গেছে। হাঃ...হাঃ... সত্যি নাকি! (শ্যাম মৃদু হাসে) তা আপনি মশাই, এখনও বেশ

আদর্শ ফাদর্শ মেনে চলেন দেখছি!... তা আমারও ছিল মশাই—ওই আদর্শ যাকে বলে। রাজযোগ আর লাইফ ডিভাইন আমার নিত্যপাঠ্য ছিল, কণ্ঠস্থ ছিল গীতাখানা। কিন্তু মশাই... (মিত্রর সঙ্গে শ্যামও দুঃখিতচিত্তে মাথা নাড়ে-হয় না।) ও হয় না। কী বলব, সাধনমার্গে আমি খানিকটা উঠেও ছিলুম। শেষ দিকে ধ্যানে বসলে গা শিরশির করত, শরীর হালকা বোধ হত, আর জ্যোতি-ফ্যোতিও খানিকটা দেখতে পেতুম। বয়স!... না, তখন আর বয়স এমনকী, কুড়ি-টুড়ি হবে। মেরুদণ্ড শালগাছের মতো সোজা রেখে হাঁটতুম, বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়াতুম বিবেকানন্দের মতো, আপনমনে বিড়বিড় করতুম—মাই ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স.হাঃ হাঃ...! সেই সময়ে, আমার কুড়ি-একুশ বছর বয়সে, রাস্তা-ঘাটে ঘরে-ছাদে, ক্যালেন্ডারের ছবিতে, সিনেমার পোস্টারে, স্মৃতিতে-স্বপ্নে এত মেয়েছেলে ছিল না মশাই! আর এখন দেখুন, হুড়মুড় করে কোথা থেকে এল এত মেয়েছেলে, ভরে গেল দেশ! বলতে বলতে কেমন ফ্যাকাশে দেখাল মিত্রকে, বিহ্বল চোখে সে একবার চার দিকে চেয়ে দেখল।

শ্যাম লক্ষ করে, মিত্রর বাঁ বগলে লড্রিতে থোয়ানো কাপড়, বাঁ হাতে বাতাসার ঠোঙা, ডান হাতে কলাপাতায় মোড়া ফুল। এখন যদি হঠাৎ মিত্রর ঘাড় কি নাক চুলকে ওঠে, তা হলে হয়তো মিত্র শ্যামকেই বলবে, দিন তো মশাই আমার ঘাড়টা (কি নাকটা) একটু চুলকে! ভাবতেই শ্যাম খুব বিনয়ের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বলল, আপনার ফুলটা আমার হাতে দিন।

মিত্র ঘাড় নাড়ে, না, না। এ আমার নিত্যকর্ম মশাই, মা কাঠের সিংহাসনে একটা ঠাকুর বসিয়েছিলেন, মরবার সময় মিনমিন করে বললেন, ঠাকুরকে একটু ফুল বাতাসা দিস। আমিও রোজ দিয়ে যাই। চার-ছ'আনায় হয়ে যায় ব্যাপারটা। নইলে মশাই, ঠাকুর-দেবতায় আমার আর তেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই। ভগবান-টগবান আছে বলে মনে হয় আপনার? বলে উৎসুক চোখে মিত্র শ্যামের দিকে তাকায়, তারপর নিজেই বলে, আছে বোধহয় কিছু একটা, কিন্তু...

বলতে বলতে গলির শেষে মিত্রর ঘরের সামনে পৌঁছে যায় তারা। মিত্র তালা খুলে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালায়, বলে, এই আমার আস্তানা।

দেয়ালে অনেক ঠাকুর-দেবতার ছবি টাঙানো, গোটা তিনেক ক্যালেন্ডার, ইজিচেয়ার, টেবিল আর এখানে-ওখানে তূপীকৃত বইপত্র। জ্যোতিষবিদ্যার দুটো পত্রিকা বিছানায় ওলটানো। টেবিলের রবিঠাকুরের ছবিতে একটা মালা পরানো, সামনে ধূপকাঠির স্ট্যান্ড। বিস্তর ধুলো জমেছে সর্বত্র। ঘরের জানালা মাত্র একটি, ভিতরের দিকে আর-একটা দরজা। মিত্র বাঁ হাতে শার্টের বোম খুলতে খুলতে ডান হাতে দরজাটার ছিটকিনি নামিয়ে বলে, ভিতরটা দেখবেন নাকি!

শ্যাম বলে, থাক।

মিত্র শ্বাস ছাড়ে, কিচেন আছে একটা। ঘুপচি একটা স্টোররুম, ফ্যামিলির কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু সব লক্ষ্মীছাড়া।

মিত্র দ্রুত ধুতি-শার্ট পালটে লুঙ্গি পরে নিল, এক লহমায় ভিতরে গিয়ে চোখে-মুখে, হাতে-পায়ে জল দিয়ে এল, তারপর টেবিলের সামনে একটা আসন পেতে মেঝেতে বসে শ্যামকে হাত দেখিয়ে একটু অপেক্ষা করতে ইঙ্গিত করল। শ্যাম লক্ষ করে, টেবিলের নীচে ঘুপচির ভিতরে একটা কাঠের ছোট্ট পালঙ্ক। সেখানে রয়েছে পিতলের গোপাল, মাটির কালী, রামকৃষ্ণ আর সারদামণির ছবি, এক দিকে আলাদা একটি পিতলের সিংহাসনে চকচক করছে শিবলিঙ্গ। ছোট থালায় গ্লাসে জল আর বাতাসা সাজিয়ে দিল মিত্র, ফুল ভাগ করে দিল সব দেবতাকে, তারপর চোখ বুজে কয়েক সেকেন্ড বসে রইল।

মিত্র উঠে দাঁড়াতেই শ্যাম বলে, কী মন্ত্র বললেন?

বললুম, ঠাকুর খাও। মা ওই মন্ত্রই বলতেন। বলে মিত্র হালকা চালে হাসে, কিছু না মশাই, এ স্রেফ অভ্যাস। অনেক দিন ভুল করে একবার দেওয়া বাতাসা আবার দিয়েছি, জ্বরজারি

হলে বিছানায় শুয়ে বলি, ঠাকুর খাও। ঠাকুর তখন কী খায় কে জানে! তবে প্রসাদি বাতাসা আমি জমিয়ে রাখি কৌটোয়। বিকেলে মুড়ির সঙ্গে চলে যায়-হাঃ হাঃ...

মিত্র সযত্নে রবিঠাকুরের ছবির সামনে ধূপকাঠি জ্বেলে দিল। শ্যাম লক্ষ করে, ছবির গলায় মালাটা তরতাজা। বোধহয় সকালে কেনা। সে বলে, ও মালাটা কেন?

মিত্র লাজুক একটু হাসে, এটাও অভ্যাস বলতে পারেন। তবে-বলে একটু দ্বিধা করে মিত্র, আপনাকে বলেছিলুম যে, ঠাকুরদেবতায় আমার আর ভক্তিশ্রদ্ধা নেই। কিন্তু কোথাও কোথাও কিছু একটা আছে মশাই... রবিঠাকুর...রবিঠাকুর...বলতে বলতে মিত্র আবার লাজুক একটু হাসে, সে একটা ব্যাপার আছে মশাই, আপনি ঠিক বুঝবেন না।

কেন?

মিত্র চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, আসলে রবিঠাকুরকে আমি খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করি।

সে তো অনেকেই করে। শ্যাম হাসে।

না, ঠিক সেরকম নয়। রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে আমি যাই না কখনও, শান্তিনিকেতন দেখিনি, রবিঠাকুরের কবিতাও আমি খুব একটা পড়িনি, কেবল বাংলা সিলেকশনে যা ছিল তাই, আর দু'-একটা ছুটকোছাটকা। পুরো কবিতা একটাও মুখস্থ নেই, তবে দু-একটা লাইন যদি বলতে বলেন তো বলতে পারি, যেমন-রমণীর মন সহস্র বর্ষেরি সখা সাধনার ধন। কিংবা, ওগো বধূ সুন্দরী...হাঃ হাঃ...না মশাই, ঠিক আপনারা যে-চোখে দেখেন, সে-চোখে নয়। রবিঠাকুর আমার কাছে অন্য রকম একেবারে অন্য রকম। আলাদা।

মিত্র এসে শ্যামের পাশে চৌকিতে বসে, গলা সামান্য নামিয়ে বলে, বিপদে পড়লেই আমি রবিঠাকুরকে ডাকি, মশাই। মিত্রর মুখ-চোখ সামান্য গম্ভীর দেখায়। বলে, ছেলেবেলা থেকেই মশাই, আমার এই অভ্যাস। ভাল মনে পড়ে না, সেই কবে ছেলেবেলায় একবার মাথায় টিকটিকি পড়েছিল বলে ভয়ে আমি দৌড় দিয়েছিলুম, দড়াম

করে ধাক্কা খেয়েছিলাম বাবার পড়াশুনোর টেবিলে, কেঁদে উঠতে গিয়ে দেখি টেবিলের ওপর রবিঠাকুরের ওই ছবি-মালা পরানো, সামনে ধূপকাঠি জ্বলছে, আমি কেঁদে বললুম, রবিঠাকুর, আমার মাথায় টিকটিকি...তুমি তাড়িয়ে দাও। আমার ঘন চুলের ভিতর থেকে তক্ষুনি টিকটিকির বাচ্চাটা ছিটকে পড়ল টেবিলে, তারপর দেয়াল বেয়ে উঠে গেল। আমি শিউরে উঠলুম। হাসবেন না মশাই, আমার মনে হয়েছিল, ছবির রবিঠাকুরের চোখে-মুখে একটু হাসি ঝিকমিকিয়ে গেল। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিল, পালিয়ে গেলুম। তারপর ক্রমে আমি বুঝতে পারলুম, আমি গোপনে একটা আলাদা রবিঠাকুরকে পেয়ে গেছি। সে আমার গোপন কথার মতো, মায়ের কাছে গায়ের জ্বর লুকিয়ে রাখার মতো করে আমি সকলের কাছ থেকে রবিঠাকুরকে আলাদা করে নিলুম, রাত্তিরে একা অন্ধকার ঘর পেরোতে পারছি না, ডাকলুম–রবিঠাকুর, আমি অন্ধকার পেরোতে পারছি না, পার করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে মনে হত খুব আপনজনের মতো কেউ আমার হাত ধরল, আমি গটমট করে পেরিয়ে যেতুম ঘর। ঘুড়ি ধরা নিয়ে একবার খালাসিপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারপিট লাগলে আমি মার খেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম–ঠাকুর, রবিঠাকুর, আমাকে এরা মারছে, তুমি আমাকে নিয়ে যাও। শুনে থমকে গিয়ে ছেলেগুলো হেসে গড়িয়ে পড়ল—রবিঠাকুর নিয়ে যাবে কী রে, ছেলেটা। তাদের হাসির ফাঁকে গলে গিয়ে আমি টেনে দৌড় মেরেছিলুম। আমি কতবার আমাদের ফুলবাগানে ঘুরে বেড়িয়েছি রবিঠাকুরের সঙ্গে, চলে গেছি বহু দূরের নীলকুঠিতে ফল খেতে, রেল ব্রিজ হেঁটে পার হয়ে চলে গেছি শম্ভুগঞ্জের মেলায়, মাঝিদের ফাঁকি দিয়ে পাট-বোঝাই দু'দাঁড়া নৌকোর গাঁটরির ফ‍াকে বসে চলে গেছি অচেনা গঞ্জে। লোকে ভাবত, একা একা গেছে সুবোধ। কিন্তু তা নয়, আমার সঙ্গে সবসময়েই থাকত রবিঠাকুর—ওই অত লম্বা, মাথায় কালো ঠোঙার মতো টুপি, গায়ে জোব্বা আর দুধ-সাদা দাড়িওলা রবিঠাকুর সবসময়ে থাকত আমার সঙ্গে, একটু কুঁজো হয়ে নরম একখানা প্রকাণ্ড হাতে ধরে থাকত আমার হাত। আমি নিশ্চিন্তে চলে যেতুম যেখানে সেখানে, পথ-হারানোর ভয় থাকত না, জানতুম রবিঠাকুর ঠিক পৌঁছে দেবে, ঝড়ে-জলে জোব্বার আড়ালে ঘিরে রাখবে আমাকে, ঘুমের আগে শুনিয়ে দেবে রূপকথার গল্প। মা, দিদি বা ঠাকুরমার কাছে কতবার শুনেছি, ভূতের ভয় পেলে বুকে রামনাম

লিখিস। সন্ধেবেলা চার তারা না দেখে ঘরে ঢুকিস না। রাত্রে সাপের নাম করলে তিনবার আস্তিক মুনির নাম নিস। আমি সে-সব মানতুম না। আমি গোপনে রবিঠাকুরকে বলতুম, এরা তো জানে না যে, আমার তুমি আছ! তারপর খুব হাসতুম দু'জনে। আমাদের দু'জনের ছিল বাদবাকি সকলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা। না, সবসময়ে নয়, সবকিছু চাইলেই যে পাওয়া যেত তা নয়। একবার একটা ছেলে আমাদের পোষা দাড়ের তোতা পাখিকে ঢিল মেরেছিল বলে আমি চেঁচিয়ে বলেছিলুম, রবিঠাকুর, ওর চোখ দুটো কানা করে দাও। তার ফলে দু'দিন বাদে আমার চোখ উঠল। আর-একবার আমি আমার ছোট বোনের কাছে আঁক করে বলেছিলুম যে, আমি রাত দশটার সময় একা একা ছাদে বেড়িয়ে আসতে পারি। সে বলল, ইল্লি! সঙ্গে সঙ্গে আমি বললুম, বাজি। সে তার জমানো পয়সা বাজি ধরলে। একদিন রাত দশটায় আমি হাসতে হাসতে ছাদে চলে গেলুম। কিন্তু নামবার সময় আমাদের পোষ বেড়ালের গায়ে পা পড়তে বেড়ালটা আমাকে আঁচড়ে কামড়ে দিল। সে রাতে রবিঠাকুর আর কথা বলেনি আমার সঙ্গে; কেননা কেন আমি জেনেশুনে বাজি ধরেছিলুম! কেন আমি ঠকিয়ে নিতে চেয়েছিলুম আমার ছোট বোনটার টিফিন-না-খাওয়া, পুঁতির-মালা-না-কেনা কষ্টে জমানো পয়সা! হ্যাঁ মশাই, যতক্ষণ আমি পবিত্র ও শুদ্ধ থাকতুম, ততক্ষণই রবিঠাকুর থাকত আমার সঙ্গে। ঝড়ে-জলে, আলোয়-অন্ধকারে, ঘরে কিংবা দূরে– সবসময়ে ওই অত লম্বা, মাথায় কালো টুপি, জোব্বা পরা দাড়িওলা লোকটা সব কাজ ফেলে আমার সঙ্গে থাকত।

ক্রমে মিত্রর চোখে চিকচিক করে ওঠে জল, না মশাই, আপনাদের রক্তমাংসের রবিঠাকুরকে আমি চোখে দেখিনি। আপনার কি মনে হয় আমার রবিঠাকুরের সঙ্গে আপনাদের রবিঠাকুরের কোনও মিল আছে?

শ্যাম মাথা নাড়ে, না।

আঃ! ঠিক তাই। আসলে আমিই ঠিক আসল রবিঠাকুরকে পেয়েছিলুম মশাই। কিন্তু রাখতে পারলুম না। ক্রমে বয়স বাড়তে লাগল, গালে এল ব্রণ, ঘুমে এল অবৈধ স্বপ্ন, চলায় ফেরায় এল সতর্কতা। আমার ভিতরে মশাই পাপ ঢুকে যেতে লাগল। তখন

রবিঠাকুরের কবিতা পড়ি স্কুলে, মানে বই থেকে অর্থ দেখে নিই। কিন্তু কেবলই মনে হয় আমি যাকে চিনতুম এ সে নয়। একদিন আমি আমাদের বাগানের কোণে শিমুলগাছতলায় বসে ঘাসের ডাঁটি দাঁতে কামড়ে আস্তে ডাকলুম, রবিঠাকুর! কোনও সাড়া এল না। আবার ডাকলুম। সাড়া এল না। এল না তো এলই না। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ডাকলুম। সকালে উঠে ডাকলুম, ছাদে গিয়ে মাঠে গিয়ে নৌকোয় চড়ে ডাকলুম। আকাশের দিকে তাকিয়ে ডাকলুম, নদীর জলের দিকে চেয়ে ডাকলুম...তারপর বসলুম আমার গোপন কান্না কাঁদতে। গেল আমার রবিঠাকুর, গেল আমার সাহস, শুদ্ধতা, গেল আমার শৈশব; বুকের শব্দে বিসর্জনের বাজনা শুনলুম।

মিত্রর চোখ বেয়ে, গাল বেয়ে নেমে এল জল, ঘুমের মধ্যে মায়ের কোল থেকে যেভাবে সরে যায় বাচ্চা ছেলে! তারপর থেকেই আমার জীবন একটা ট্র্যাজেডি মশাই...

বলতে বলতে আস্তে ফুপিয়ে ওঠে মিত্র, হাঁটু মুড়ে মুখ গুঁজে দেয়, কাঁদতে থাকে। একটা ঘোরের মধ্যে শ্যাম এগিয়ে গিয়ে মিত্রর কাছ ঘেঁষে বসে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, এলোমেলোভাবে বলতে চেষ্টা করে, আমি বুঝতে পেরেছি, আমি বুঝতে পেরেছি...

শ্যাম মিত্রর অস্ফুট কথা শুনতে পাচ্ছিল, রবিঠাকুর ছাড়া আর আমার কিছু নেই—নেই। এখন আমাকে কে আবার দেবে সেই রবিঠাকুর? কে দেবে?

গভীর দুঃখে শ্যাম মাথা নাড়ে, ঠিক।

মুখ না তুলেই মিত্র বলে, সবচেয়ে বড় কথা কী জানেন!

কী?

আমার আর ভালবাসা নেই।

ভালবাসা নেই? শ্যাম অবুঝের মতো প্রশ্ন করে।

নেই। আমি আর কোনও দিনই কোনও কিছুকেই তেমন করে ভালবাসতে পারলুম না। বলেই মিত্র গভীরতর কান্নায় ডুবে যেতে লাগল।

মিত্রকে কাঁদতে দিয়ে শ্যাম ধীর, নিঃশব্দ পায়ে উঠে এল। বেরিয়ে এল রাস্তায়। অন্যমনস্কভাবে সিগারেটের প্যাকেট হাতড়ে বের করল পকেট থেকে। দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে খস শব্দে হঠাৎ মনে পড়ে যে, আজ একত্রিশের জন্মদিন পার হয়ে গেল। মিত্রকে খাওয়ানোর কথা ছিল আজ। হল না। সামান্য একটু হেসে শ্যাম হটতে থাকে।

গলির মুখে নির্জন রাস্তায় হঠাৎ একটা খুব লম্বা লোক শ্যামের উলটো দিক থেকে হেঁটে আসে। চমকে যায় শ্যাম–মিনু না! না, মিনু না, অন্য লোক, অনেকটা মিনুর মতো দেখতে।

দোতলার সিঁড়িতে সাদা একটা বেড়াল বলের মতো গোল হয়ে শুয়ে ছিল। শ্যাম অন্য মনে লাথি ছুড়ল, 'ফ্যাঁস' করে লাফিয়ে ওঠে বেড়ালটা, নিঃশব্দে বিদ্যুৎগতিতে দৌড়ে উঠে যায় সিঁড়ির মাথায়, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শ্যামের দিকে তাকিয়ে থাকে। শ্যাম দাঁড়িয়ে থাকে, বেড়ালটার দিকে চেয়ে দেখে ভয়ংকর ঘেন্নায় রাগে বেড়ালটার দু'চোখ জ্বলছে। শ্যাম টের পায়, তার সামনের বাতাস বিদ্বেষে বিষিয়ে আছে। সিঁড়ি ভাঙতে পা তোলে শ্যাম, কিন্তু এগোতে পারে না। বেড়ালটা স্থির চোখে তাকে দেখে। হঠাৎ সে শুনতে পায়, তাকে ফেলে রেখে তারই পায়ের শব্দ সামনের সিঁড়ি ভেঙে উঠে যাচ্ছে। আর্তনাদ করে উঠতে গিয়ে আস্তে হেসে ফেলে শ্যাম। না, সব ঠিক আছে। সে নিজেই উঠছে সিঁড়ি ভেঙে! শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য সে নিজের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

অনেক রাতেও শ্যাম তার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বাইরে ঘন কুয়াশা, গাছপালা স্থির। একটা ল্যাম্পপোস্টের একটু পাথুরে আলোর ভিতর দিয়ে ল্যাঙ ল্যাঙ করে একটা ঘেয়ো কুকুর চলে যায়। দূরে পুলিশের বুটের শব্দ ঘুরে বেড়াচ্ছে শূন্য রাস্তায়।

শ্যাম তার সকালে কেনা প্যাকেটের শেষ সিগারেট ঠোঁটে চেপে ধরে।

দেশলাই জ্বালবার খস শব্দে ভীষণ চমকে ওঠে সে। তার মাথার ভিতরে টলমল করে ওঠে ঘোলা জল। শূন্য চোখে কুয়াশার দিকে চেয়ে হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়–মাই গু-উ-ডনেস! টু-ডে কিলড এ ম্যান!

৬. লোকটা যে মরেছেই

লোকটা যে মরেছেই, এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অনেকেই দেখেছে ব্যাপারটা, পাড়ায় একটু খোঁজ-খবর করলেই সঠিক খবরটা জানা যেতে পারে। তবু সামান্য দ্বিধায় পড়ল শ্যাম, কেননা, সে যে জানালায় দাঁড়িয়ে আয়নার আলো ফেলছিল এটাও অনেকের পক্ষে দেখে থাকা সম্ভব।

সকালে উঠে তাই শ্যাম প্রথমে খবরের কাগজটা দেখল। না, তাতে কোনও মোটর-সাইক্লিস্টের মৃত্যুর খবর নেই। একজন সাইক্লিস্টের সঙ্গে একটি টেম্পো ভ্যানের ধাক্কা লেগেছিল চিৎপুরে, একটি বাচ্চা ছেলে মারা গেছে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে রাস্তা পার হতে গিয়ে লরির চাপায়, একজন অজ্ঞাতনামা (৪০)। লোক বাস থেকে পড়ে গিয়ে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে, আর- একজন...না, কোনও মোটরসাইক্লিস্ট নয়। কাল কলকাতায় কোনও মোটর সাইক্লিস্টেরই মৃত্যু হয়নি।

বড় হতাশ হল শ্যাম। এখন এই লোকটা, এই মোটর-সাইক্লিস্ট লোকটা যদি মরে না গিয়ে থাকে, তবে হয়তো তার হাত-পা একটু কেটেকুটে গেছে, কিংবা ভেঙেছে কয়েকটা হাড়গোড়। সে ক্ষেত্রে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসবার পর লোকটা অনায়াসে তার জানালাটা খুঁজে বার করতে পারে, এবং তারপর তাকেও। তখন একদিন না একদিন অকারণে আয়নার আলো ফেলার জন্য তাকে একটা অচেনা লোকের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। শ্যাম জানে লোকটা আইনগতভাবে কিছুই করতে পারে না। তবে লোকটা খুব লম্বা চওড়া এবং নিষ্ঠুর হতে পারে। না, তাকে ভাল করে দেখেনি শ্যাম শুধু আয়নার আলো তার মুখে ফেলে জানালার নীচে বসে পড়েছিল। কেন আলো ফেলেছিল তা শ্যামের জানা নেই, তবু শ্যাম মাত্র এইটুকুই বলতে পারে।

না মশাই, আপনার ওপর আমার কোনও রাগ ছিল না। আপনাকে আমি চিনতুমই না। অনেক দিন ধরে আমার হাতে কোনও কাজ নেই, জমানো টাকা ফুরিয়ে আসছে, আর

ক্রমে ক্রমে আমি কেমন ঠান্ডা মেরে আসছি। কাজেই শরীর-মন গরম রাখার জন্য, ঝিমিয়ে পড়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সারাদিন আমাকে নানা খেলা তৈরি করে নিতে হয়। এই সবকিছুই মশাই একটি কার্যকারণসূত্রে বাঁধা। যদি একটা মা-বাপ তোলা গালাগাল আমি সহ্য করতে পারতুম তা হলে আমি আজও থাকতুম সেই শ্যাম– যে টেলিফোন তুলে নেওয়া থেকে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা, এই সব কাজই খুব সুন্দর এবং ভদ্রভাবে করত, যে সারাদিন কেবল নিজের কথাই ভেবে যেত এবং তা হলে এই আলো-ফেলার খেলা তাকে খেলতে হত না এবং আপনিও নিরাপদে তেমাথায় মোড় ঘুরতে পারতেন–

শ্যামের এইসব যুক্তি যে লোকটা শ্যামের মতো করেই বুঝবে তার কোনও মানে নেই। সে-ক্ষেত্রে লোকটা শ্যামের দিকে দু'-এক পা এগিয়ে আসতে পারে। তখন কী করা উচিত তাও শ্যাম ভেবে দেখল। সেক্ষেত্রে হাতের কাছে কিছু অস্ত্রশস্ত্র থাকা দরকার, দেয়ালে থাকা দরকার একটা পালিয়ে যাওয়ার গুপ্ত দরজা, আর জানালা দিয়ে নেমে যাওয়ার জন্য একটা দড়ির সিঁড়ি। কিংবা, ইতুর সঙ্গে যে ছোঁয়াছুঁয়ির খেলাটা খেলেছিল শ্যাম, সেই খেলাটাও তখন খেলা যেতে পারে। কিংবা সুবোধ মিত্রকে গিয়ে বলা যেতে পারে এক জায়গায় বেশি দিন থাকা ঠিক নয় মশাই, আসুন আমরা ঘর বদল করে ফেলি।

শ্যাম সামান্য উত্তেজনা বোধ করতে থাকে। সে দ্রুত তার ঘরের চার দিক ঘুরে ঘুরে দেখে নেয়। একটা মাত্র দরজা, তারপর অপরিসর প্যাসেজ, সিঁড়ি। জানালার কাছে এসে দেখে, প্রায় বারো-চোদ্দো ফুট নীচে শান বাঁধানো ফুটপাথ। ফিরে আবার ঘরের দিকে চেয়ে দেখে শ্যাম। চিন্তায় তার ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। ডান দিকের দেয়ালে বাথরুমের পলকা দরজা। নিজেকে খুব নিরাপদ মনে হয় না শ্যামের। কোনওখানেই নেই লুকিয়ে থাকবার নিরাপদ জায়গা, বা পালিয়ে যাওয়ার সহজ পথ। লোকটা যদি খুব গায়ের জোরওয়ালা নোক হয়, যদি খুব লম্বা-চওড়া, নিষ্ঠুর হয়, তা হলে আত্মরক্ষার জন্য শ্যামকে একটু প্রস্তুত থাকতে হবে। ভাবতে ভাবতে উত্তেজনায় শ্যাম ঘরের ভিতরে অদৃশ্য এবং অনুপস্থিত প্রতিপক্ষের তাড়া খেয়ে এদিক-ওদিক দ্রুত সরে গেল। লাফ মেরে উঠল চৌকিতে, কয়েক পাক

ঘুরল, বাতাসে ঘুষি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে গেল, ঘুষি মারল দেয়ালে যেমন ঘুষি খেয়ে একবার রূপশ্রী ফার্নিচার্সের ওয়ার্ডরোবের পাল্লাটা চোট খেয়েছিল, আর দেয়ালের একটা দুর্বল অংশের চুনবালি পড়েছিল খসে।

তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে শ্যাম আপনমনে বলল, না মশাই, আপনার ওপর আমার কোনও রাগ নেই। ছিলও না। বলতে বলতে বাতাসে হাত এগিয়ে দিল শ্যাম খুব বিনীতভাবে, অদৃশ্য এবং অনুপস্থিত লোকটার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল, তারপর বলল, চা খাবেন?...হা হা বসুন, বিছানাতেই বসুন, কিংবা বলতে বলতে শ্যাম ঘরের একমাত্র চেয়ারটাকে জানালার কাছে টেনে আনল, কিংবা এই চেয়ারটায় বসুন, রোদে পিঠ দিয়ে। চমৎকার আরাম লাগবে, তারপর আমি আপনাকে দেব। গরম-গরম এক কাপ চা–

বলতে বলতে শ্যাম সারা ঘরে পায়চারি করে বেড়ায়, না, আপনাকে খুব একটা খারাপ দেখাচ্ছে না। যদিও আপনার মুখটা একটু কেটেকুটে গেছে, একটা হাতে এখনও ব্যান্ডেজ, তবুও আপনাকে বেশ বীরের মতোই দেখাচ্ছে অনেকটা যুদ্ধফেরত সোলজারের মতোই। আপনি কি বিবাহিত? না? তা হলে আরও ভাল, এই অবস্থাতে আপনি মেয়েদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করতে পারবেন। আমাদের দেশের মেয়েরা বীরপুরুষ ছেলেদের দেখাই পায় না, যে পুরুষ তারা দেখে সে-সব ছোকরারা মিনমিন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েদের স্কুল কলেজের আশেপাশে, যাতায়াতের রাস্তায়, পিছু নিচ্ছে কিছুদূর পর্যন্ত, ভুল বানানে লিখছে প্রেমপত্র, পরিচয় হলে নিয়ে যাচ্ছে বড়জোর লেক বা ময়দানে, ভিক্টোরিয়ায় বা পার্কে, তারপর সেখানে বসে...থাকগে! আসল কথা, আহত পুরুষ মেয়েরা পছন্দ করে। তা ছাড়া, আপনাকে ষাঁড়ে গুঁতিয়ে দেয়নি, আপনি টেম্পো বা ঠেলাগাড়ির ধাক্কা খাননি, রাস্তার হামেশা হাঙ্গামায় বেমক্কা ইটের টুকরো এসে পড়েনি আপনার গায়ে আপনি খানাখন্দেও পড়ে যাননি। আপনি আহত হয়েছেন মোটর-সাইকেল দুর্ঘটনায়। ব্যাপারটার মধ্যে একটু বীরত্বের গন্ধ আছে? বলতেই চোখে ছবি ভেসে ওঠে–একটু অহংকারী, সাহসী ছুটন্ত এক পুরুষ দুটো ছড়ানো হাতে বুনো ঘোড়ার ঝুঁটির মতো ধরে-থাকা মোটরসাইকেলের কঁপা হাতল, বুক চিতিয়ে, পা বাঁকিয়ে বসে থাকার সেই উগ্র ভঙ্গি,

হাওয়ায় উড়ছে চুল, শার্টের কলার এলোমেলো, দাঁতে টিপে রাখা একরোখা একটু হাসি...চমৎকার নয়! ছেলেবেলা থেকেই মোটর-সাইক্লিস্টদের আমি ওই চোখে দেখে আসছি। বলতে কী, আমার জীবনের একসময়ে একমাত্র লক্ষ্য ছিল বেপরোয়া একজন মোটর-সাইক্লিস্ট হয়ে যাওয়া–আর কিছু নয়-কেবল খুব ছুটন্ত একটা মোটর-সাইকেলে ওইভাবে বসে থাকা। সেই কারণেই আমার সতেরো-আঠারো বছর বয়সে প্রথম কলকাতায় এসে আমি সার্জেন্ট দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। কোমরে ধূসর রঙের পিস্তল, মাথায় কালো টুপি আর ওই লাল মোটর-সাইকেল! সার্জেন্ট দেখলে আমি রাস্তার সুন্দরী মেয়েদেব লক্ষই করতুম না...

চেয়ারে অদৃশ্য লোকটা নড়ে ওঠে যেন।

শ্যাম সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে বলে, না মশাই, আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কিছু বলছি না, একথা সত্যিই যে খেলার জন্যও আপনার মুখে আয়নার আলো ফেলা ঠিক হয়নি...কিন্তু দেখুন, আমারও কিছু করার নেই। বড় অসময় চলছে...সকাল থেকেই দিন লম্বা হতে শুরু করে, সন্ধে থেকেই রাত অফুরান মনে হয়। কিছুই ঘটে না, বস্তুত কিছুই ঘটে না। দিনে দু'বার চিঠির বাক্স খুলি; আমি...পাখির বাসার মতো ছোট্ট চিঠির বাক্স খুলতে গিয়ে প্রতিবার মনে হয় দরজা খুললেই লাফিয়ে পড়বে একটা খরগোশের বাচ্চা, কিংবা হাত দিলেই পাওয়া যাবে গোলাপি কাগজে মোড়া কোনও উপহার, কিংবা অচেনা মেয়ের লেখা ভালবাসার চিঠি। কিছুই ঘটে না, বস্তুত কিছু ঘটে না।...সকালে উঠে মনে হয় আজ কেউ আসবে খুব অচেনা রহস্যময় কেউ–যাকে দেখে মনে হবে চেনা, অথচ চেনা যাবে না, এবং যে যাওয়ার সময় কিছু রহস্য রেখে যাবে; ঘুমোবার সময়ে মনে হয় আজ স্বপ্নের ভিতরে আমি পেয়ে যাব কোনও দৈব শিকড়বাকড়, ক্যানসারের ওষুধ কিংবা গুপ্তধনের সন্ধান; কুয়াশার রাস্তায় হাটবার সময়ে, মনে হয়, কুয়াশা কেটে গেলেই দেখতে পাব আমি হঠাৎ অচেনা বিদেশে পৌঁছে গেছি, যেখানে খাওয়ার লোক নেই বলে ইলিশের ঝক চলে যাচ্ছে সমুদ্রে, গোরুর বাঁট থেকে খসে পড়ছে দুধ, চাক থেকে মধু চুইয়ে মাটি যাচ্ছে ভিজে, যেখানে সৎ ব্যবসায়িরা দোকান সাজিয়ে বসে আছে যেখানে সারা দেশে

এক দাম, যেখানে শান্ত ধার্মিক মানুষেরা ধীর পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সারা বছর যেখানে চলেছে উৎসব...

শ্যাম চেয়ারটার সামনে এসে দাঁড়ায়, মাথা নাড়ে-কিছুই ঘটে না! বস্তুত কিছুই ঘটে না।

তারপর শ্যাম বিনীতভাবে অদৃশ্য অনুপস্থিত লোকটাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়, আচ্ছা, আবার দেখা হবে...

ঘরের মাঝখানে আবার ফিরে আসে শ্যাম, বিষণ্ণভাবে চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ 'ইয়াঃ' বলে চমকে হেসে ওঠে। সিগারেট ধরিয়ে আবার খবরের কাগজটা তুলে নেয়, গুনগুন করে বলে, মাই গু-উ-উ-নেস, আই কুডনট কিল দ্যা ম্যান।

ঘরের চারি দিকে অন্যমনে চেয়ে দেখে শ্যাম-নাঃ, বস্তুত কোথাও নেই লুকিয়ে থাকবার জায়গা, কিংবা পালিয়ে যাওয়ার সহজ পথ।

.

দুপুরে বেরোনোর সময় শ্যাম তিনটে চিঠি পেল।

জীবনবিমার প্রিমিয়ামের চিঠি, খামের উপর দুহাতে আড়াল করা প্রদীপের ছবি। আপনার জীবন মূল্যবান। ইলেকট্রিকের বিল, আর পাকিস্তানের কালচে খামে বাবার চিঠি। কোনওটাই ভাল করে পড়ে দেখে না শ্যাম। বাবার চিঠির দিকে চেয়ে থাকে, মাঝে মাঝে হঠাৎ এক-আধটা লাইন চোখে পড়ে-সঞ্চয়ি না হইলে ভবিষ্যতে নিরুপায় হইবা...এতদূর হইতে আমরা তোমার জন্য আর কী করিতে পারি, ভরসা একমাত্র দয়াল ঠাকুর...চাকুরীর বন্দোবস্ত হইল কিনা সত্বর জানাইবা...সোনাকাকা ও রাঙাপিসির খোঁজখবর লইও, অভাবের সময়ে আত্মীয়স্বজন...আশু গাঙ্গুলীর সহিত দেখা করিও। সে আমার বাল্যবন্ধু, হাওড়ায় তিনটা লোহার কারখানা, ডোভার লেনে চারিতলা বাড়ি, গাড়ি...জমিজমা আর কিনিতে ভরসা হয় না, অসময় পড়িয়াছে...সময় থাকিতে হিন্দুস্থানে না যাওয়া

অবিবেচকের কাজ হইয়াছে...এখানে গঙ্গা নাই, বড় দুঃখ...ধনভাইয়ের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, সমারোহ হয় নাই, হিন্দুস্থান হইতে তাহার ছেলেরা আসিতে পারে নাই, জ্ঞাতিরা মুখাগ্নি করিয়াছে...বড় ভয় হয়...তোমার মায়ের অবস্থা পূর্ববৎ শয্যাশায়ি, পুলিনের বউ আসিয়া রান্নাবান্নার কাজ করিয়া দিয়া যায়...তোমার মা ঘুমের মধ্যেও মাঝে মাঝে তোমার নাম ধরিয়া ডাকেন...ওখানে জিনিসপত্রের দাম...চালের দাম যাহা শুনি, তাহাতে আশ্চর্য হইতে হয়...বাঙালির ছেলে, দু'বেলা ভাত না খাইলে শরীর থাকে না...সাবধানে থাকিও...এখন ঠাকুর ভরসা...তোমাকে সংসারী দেখিয়া যাইতে পারিলে নিশ্চিন্তে চোখ বুজিতাম।

দশ বছর আগে বাবা শেষবার এসেছিল কলকাতায়, শেয়ালদায় আনতে গিয়েছিল শ্যাম। দেখল, যেন একটা অচেনা লোক, একটু কুঁজো, কালো রোগা চেহারা। প্রণাম করতেই পিঠে হাত রেখেছিল বাবা, কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপেছিল, মনু কেমন আছ? যে কয়দিন ছিল, বাবা একটুও স্থির থাকেনি। কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর, বৈঁচীগ্রাম, সোদপুর কিংবা ডায়মন্ড হারবার ঘুরে বেড়িয়েছিল আত্মীয়দের বাড়ি বাড়ি। তাকে ডেকে বলত, মনু চিন্যা রাখ। আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিগুষ্ঠি চিন্যা রাখতে হয়, বিপদে আপদে আপনা রক্তের মানুষ কামে লাগে। এদিকে জমিজমার খোঁজ করেছিল, সম্পত্তি বিনিময়ের চেষ্টাও হয়েছিল একটু, তারপর বলেছিল, আমাগো আর আহন হইব না। ভাল লাগে না রে মনু, এই দ্যাশ বড় রুঠা! পাকিস্তান উঠে যাবে কি না সে খোঁজখবরও একটু নিয়েছিল বাবা। মা পাঠিয়েছিল আমসত্ত্ব, গোকুল পিঠে আর নতুন কাপড়। মাসখানেক পরে বনগাঁয়ের সীমানা পর্যন্ত বাবাকে এগিয়ে দিয়ে এসেছিল শ্যাম। মনু, ভাল থাইকো—এই কথা বলে বাবা এদেশের সীমা ডিঙিয়ে গেল।

এখন, এই যে লোকটা তাকে চিঠি লেখে, তার ভালমন্দের খবর নেয়-এ লোকটা কে! বাবা? কীরকম বাবা। তার মুখ মনে পড়ে না, ভিনদেশি এক অচেনা লোক, ভিটের মায়া ছেড়ে আসতে পারেনি— এ লোকটার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? শ্যামের বাক্সে বাবা-মার একটা জোড়ের ফটো আছে। পিছনে রাজবাড়ির সিন্ ফেলা, পাশে টব, সুতির ডোরাকাটা

একটা কোট গায়ে, ধুতি আর পাম্প-ও পরা গ্রাম্য লোকটা বুক চিতিয়ে বসে আছে, পাশে ধোয়া পাট-ভাঙা জংলা-পেড়ে শাড়ি-পরা মা-জবুথবু, ছোট্ট একটুখানি মানুষ, ক্যামেরার লেনসের দিকে কৌতুহলী চোখ। বিশ্বাস হতে চায় না যে এঁরা শ্যামের মা বাবা, এঁরাই তার জন্মের কারণ। এঁরাও তো জানেন না শ্যাম কে, কিংবা কোথা থেকে এল!

না, বহুকাল আর সেই ছবি বের করে দেখে না শ্যাম, আগে মায়ের জন্য কাঁদত, পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে কিংবা নতুন চাকরিতে যাওয়ার সময়ে প্রণাম করে যেত ওই ছবি। তারপর আস্তে আস্তে কপূরের গন্ধের মতো মন থেকে মুছে গেছে ওই দুটি মুখ। মনে পড়ে না, আর তেমন করে মনে পড়ে না। কেবল মাঝে মাঝে হরিধ্বনি দিয়ে যখন মড়া নিয়ে যায়, তখন চমকে উঠে মনে পড়ে কুয়োতলা, ঘাটে যাওয়ার মেঠো পথ, করমচার গাছ, পরে লাফিয়ে পড়ছে ব্যাঙ; মনে পড়ে, প্রকাণ্ড এক অন্ধকারের মধ্যে উত্তরের ঘরের দাওয়ায় ছোট্ট একটু হ্যারিকেনের আলো কোলে করে মা বসে আছে মুখের চামড়ায় নেমেছে শিকড়বাকড়, কথা বলতে গেলে মাথা কাপে—সামনের অন্ধকার, এক-আকাশ অস্পষ্ট নক্ষত্র, আর রক্তের মধ্যে অতি দুর্বোধ্য মৃত্যুর হিম অনুভব করতে করতে অসহায় মা বীজমন্ত্র ভুলে গিয়ে বিড়বিড় করে বলে চলেছে–"মনু, মনু রে, অ মনু মনু...মনু, মনু রে, অ মনু...' ।

মনে মনে শ্যাম প্রশ্ন করে, তুমি আমার কে? তোমরা কারা? না, আমি তোমাদের চিনি না। তারপর চমকে ওঠে সে, অস্থির হয়ে আবার বিড়বিড় করে বলে, তোমরা ভাল থেকো। বেঁচে থেকো। আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি ভাল আছি। আমি খুব ভাল আছি। দেখো, একদিন খুব সুসময় এসে যাবে। ভাল জমিতে আমরা তুলব ঘড়বাড়ি, তৈরি করব বাগান, মাছ ছেড়ে দেব পুকুরে, ছাড়া জমিতে বসিয়ে দেব জ্ঞাতিদের ঘর, এক-আধজন বোষ্টম, আর ধোপানাপিত। দূর বিদেশ থেকে আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসব, আমি নৌকো বোঝাই করে নিয়ে আসব সুদিন...। সেই কবে ছেলেবেলায় শোনা ঘুমপাড়ানি গান গুনগুন করে শ্যাম, মায়রে দিলাম ডবল শাঁখা, ভাই করাইলাম বিয়া, বাপরে দিলাম সোনার মটুক, তীর্থ কর গিয়া...

৭. ঠিক দুপুরবেলা গড়িয়াহাটার মোড়

ঠিক দুপুরবেলা গড়িয়াহাটার মোড় থেকে একটা লোকের পিছু নিল শ্যামা অকারণে। লোকটা কালো, হাড়গিলে রোগা চেহারা, অত্যন্ত কর্কশ তার মুখ, সেই মুখে মোটা গোঁফ, চোখে গগলস; পরনে টেরিকটনের গাঢ় রঙের চাপা চোঙা প্যান্ট, গায়ে ঝকঝকে ক্রিম রঙের সিল্ক শার্ট, হাতে ফোলিও ব্যাগ। চমৎকার ঝকমকে পোশাকের ভিতরে কালো হাড়গিলে লোকটাকে বেমানান এবং আরও কুচ্ছিত দেখাচ্ছিল যেন কারও জামাকাপড় চুরি করে এনে পরেছে।

লোকটা বাটার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ জুতো দেখল, তারপর শ্লথ গতিতে হেঁটে গেল মোড় পর্যন্ত, সিগারেটের দোকান থেকে কিনে নিল এক প্যাকেট সস্তা সিগারেট, কাপড়ের দোকানের ডামির দিকে চেয়ে একটু হাসল আপনমনে, একটা কান ভিখিরিকে তাড়া দিল,দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ করল একটি সুন্দরী মেয়ের চলে যাওয়া। তারপর ধীর গতিতে রাস্তা পার হয়ে ট্রামস্টপের দিকে চলে যাচ্ছিল লোকটা।

আগাগোড়া লোকটাকে লক্ষ করছিল শ্যাম। মনে হয় খুব সহজ শান্ত ও ভদ্র জীবন যাপন করে না লোকটা। চার দিকে ওর সতর্ক চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে ওরনের লোকই ভদ্রলোকদের পকেট হাতড়ে দেখে, কিংবা নিদেন সবার অলক্ষ্যে মেয়েদের নরম বুক ছুঁয়ে সরে যায়। একটা কিছু এধরনের কাজ করবেই লোকটা। শ্যাম নিশ্চিত। সামান্য উত্তেজনা বোধ করে শ্যাম, লোকটাকে চোখে চোখে রাখে, পিছু নিয়ে এসে ট্রাম-স্টপে দাঁড়ায়। লোকটা সবুজ রুমাল বের করে অকারণে ঘাড় গলা মোছে, স্টপে দাঁড়ানো মেয়েদের লক্ষ করে চোখেমুখে চিকমিক করে ওঠে কামনা-বাসনা। কিন্তু কিছুই করে না লোকটা।

ট্রামে উঠেও লোকটা খুবই ভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েদের কাছে ঘেঁষে না, ভদ্রলোকদের পকেটের দিকে তাকায় না।

এন্ডির চাদরের ভিতরে শ্যামের হাত মুঠো পাকিয়ে যায়, সে মনে মনে বলে, এবার একটা কিছু করো হে, আমি তোমার অপেক্ষায় আছি। ভয় কী! ওই যে মোটা মতো লোকটা, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, ঘাড়ের চুল পুলিশদের মতো করে ছাঁটা, লক্ষ করে দ্যাখো লোকটা ঢুলছে। ওর বুক-পকেট থেকে মুখ বের করে আছে একটা খাম। ওটা তুলে নাও। কিংবা ওই যে মেয়েটা উঠে দাঁড়াল, পরনে মভ রঙের শাড়ি, মাথায় বিড়ে-খোঁপা, ওর চোখ-মুখ দ্যাখো– সুন্দর নয়, কিন্তু বাঘিনীর মতো কামুকা– জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটা ওর স্বভাব– ওর গায়ে তুমি নিশ্চিন্তে হাত দিতে পারো কিছুই হবে না। ভয় কী?

কিন্তু লোকটা খুব ভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে থেকে একটু কুঁজো হয়ে জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তাঘাট দেখবার চেষ্টা করে। শ্যাম হতাশ হতে থাকে। এমন পাকা বদমাশের মতো চেহারা তোমার!–শ্যাম বলতে থাকে, তুমি শুধু চোখ দিয়ে যে-কোনও মেয়েকে গর্ভবতী করে দিতে পারো, শুধু চোখের ইশারায় তুমি তুলে নিতে পারো আমাদের পকেটের মনিব্যাগ। দেখাও। সেই ম্যাজিক দেখাও। ভয় কী হে! বাক আপ! চিয়ারিও!

তবুও লোকটা দাঁড়িয়েই থাকে। তার অন্যমনস্ক চোখেমুখে নরম এক ধরনের কবিত্বের ভাব ফুটে ওঠে। খুব হতাশ হয়ে শ্যাম লক্ষ করে যায়।

তবু শ্যাম পিছু ছাড়ল না।

লোকটা গ্র্যান্ড হোটেলের উলটো দিকে নেমে পড়ে। তারপর রাস্তা পার হয়ে বড় রাস্তা ধরেই অনেক দূর হেঁটে যায়। সুরেন ব্যানার্জি রোডে ঢুকে পড়ে। একটু দূরে থেকে শ্যাম হটতে থাকে। লোকটা একবার ঘাড় ঘোরাতেই তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসির চেষ্টা করে শ্যাম, হাসি দিয়েই বোঝাতে চায়–ভয় পেয়ো না, আমি শুধু দেখতে চাই যে, তুমি একটা কিছু করো। তুমি করিতকর্মা লোক–কিছু করো হে! বিশ্বাস করো আমি তোমাকে ধরব না বা ধরিয়ে দেব না। নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তুমি।

লোকটার ভ্রূ সামান্য কুঁচকে ওঠে। তারপর মুখ ফিরিয়ে সে হাঁটতে থাকে। এলোমলো রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে হেঁটে যায়। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে শ্যামকে লক্ষ করে। খুবই উত্তেজনা বোধ করে শ্যাম। তারপর অবশেষে লোকটা ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের কাছে এসে একটা বড় বাড়ির মধ্যে সোজা গট গট করে হেঁটে গেল। লোকটা ভয় পেয়ে গেছে-ভাবে শ্যাম। আবার তার শরীরে শীতভাব ফিরে আসে। হতাশ বোধ হয়।

শূন্য মনে খানিকটা ঘুরে বেড়ায় শ্যাম। তারপর একটা ফাঁকা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ে। শান্তভাবে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকে। তার সামনে এক কাপ গরম চা জুড়িয়ে জল হয়ে যায়।

পাশের টেবিল থেকে একজোড়া সিন্ধি ব্যবসায়ি উঠে গেল, অন্য ধারে এসে বসল চর্বির পাহাড় গলায় থাক থাক গলকম্বলওয়ালা এক পাঞ্জাবি। ঘুম ঘুম চোখে একবার শ্যামকে চেয়ে দেখল।

বাইরে ছায়াহীন রোদ গড়িয়ে যাচ্ছে রাস্তায়, ওধারের বাড়ির আলসে থেকে পিছলে পড়ে পাখা মেলে দিল একটা পায়রা, ঠক ঠক করে হেঁটে গেল দুটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে।

উঠে পড়ে শ্যাম। কাউন্টারে দাম দিয়ে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল, ঠিক সে সময়ে দরজার চৌকাঠে তার মুখের ওপর একটা ছায়া এসে পড়ে। বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে ওঠে শ্যামের হৃৎপিণ্ড– সেই লোকটা! পিছনে ঝকমক করছে রোদ, লোকটার মুখ তাই অন্ধকার দেখায়। হাতের পাতায় চোখ আড়াল করে শ্যাম এক পা পিছু হটে আসে। লোকটা এক পা এগিয়ে আসে, শ্যাম।

না, সে লোকটা নয়। পরনে নেভি ব্লুসুট, গলায় বো, সুন্দর চেহারার ফরসা একটা লোক শ্যামের সামনে দাঁড়ায়।

অরুণ! যেন ডুবে যাচ্ছিল শ্যাম, এমন ব্যগ্র হাত বাড়িয়ে অরুণের একখানা হাত চেপে ধরে সে, আঃ, অরুণ!

ইসস! তোকে চেনাই যায় না!

তুই! শ্যাম অরুণকে ভাল করে দেখে, তুই খুব সুন্দর হয়ে গেছিস।

দূর! মৃদু হাসে অরুণ, অ্যালকোহলিক ফ্যাট। তোর কী খবর?

ভাল। শ্যাম মাথা নাড়ে।

কিন্তু তোকে ভাল দেখাচ্ছে না। দাড়ি-ফাড়ি দিয়ে চেহারাটা কী যে বানিয়েছিস! বলতে বলতে শ্যামের হাত ধরে টেনে নেয় অরুণ। দু'জনে মুখোমুখি বসে। বসেই অরুণ বলে, শুনেছি ঝগড়া করে চাকরি ছেড়েছিস!

শ্যাম নিঃশব্দে মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

অথচ তুই কী ভীষণ ড্যাশিং পুশিং ছিলি! কত ওপরে উঠে যাওয়ার কথা ছিল তোর। আর কী দশা করেছিস নিজের।

শ্যাম চুপ করে থাকে।

শালার বস আমারও ছিল তেরিয়া, তাই বাঁচার জন্য একদিন তার কালো কুচ্ছিত মেয়েটাকে নিয়ে লম্বা দিলুম। লোকটা চেঁচামেচি করল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেনেও নিল।...দুটো লিফট পেলুম পর পর।...একটা দুঃখ ভাই, ছেলেবেলা থেকেই একটা সুন্দর বউয়ের শখ ছিল আমার। সেটা হল না। বলতে বলতে মৃদু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে অরুণ, তবে পুষিয়ে নেব, দেখিস। ফেব্রুয়ারিতে চললুম আমেরিকা...বউকে রেখে যাচ্ছি তার বাপের বাড়িতে...।

চেয়ে থাকে শ্যাম। অরুণকে খুব ফরসা দেখাচ্ছে। সাহেবি পোশাকের জন্য নয়, রং ফরসা বলেও নয়, শ্যাম লক্ষ করে দেখে, চোখে-মুখে কেমন এক ধরনের বিদেশি ছায়া পড়েছে অরুণের। হঠাৎ তাকে খুব দূর বিদেশের অচেনা লোক বলে মনে হয়।

চা শেষ করে উঠে পড়ে দু'জনে।

কোথায় যাবি? রাস্তায় এসে অরুণ জিজ্ঞেস করে।

শ্যাম মাথা নাড়ে, জানি না।

দূর শালা! অরুণ হাসে, তুই কেমন ম্যান্দা মেরে গেছিস! আমার সঙ্গে চ...

কোথায়? খুব নিস্তেজভাবে বলে শ্যাম।

চোখ নাচিয়ে অরুণ হাসে, ভাল জায়গা। সাহেবের অফিস। সুন্দরী রিসেপশনিস্টের মুখোমুখি বসে থাকবি। ভিসার ব্যাপারে এক মার্কিন সাহেবকে ধরা-করার ব্যাপার আছে– আধঘণ্টার কাজ। চ–

রাস্তায় একটা ছোকরা জুতো-পালিশওয়ালাকে দিয়ে জুতো পালিশ করিয়ে নিল অরুণ। ঝুঁকে পালিশওয়ালাকে বলল, দ্যাখ জুতোয় তোর মুখ দেখা যাচ্ছে?

ছেলেটা ঝুঁকে মুখ তুলে হাসল, জি হাঁ।

তব ঠিক হ্যায়। বলে অরুণ পয়সা দিয়ে দেয়। হাঁটতে থাকে।

নিজের ভিতরে এক অদ্ভুত শীতলতা অনুভব করে শ্যাম। যেন সব কাজ, আনন্দ এবং উৎসাহ থেকে অবসর নেওয়া হয়ে গেছে। এখন চলেছে তার অবসরের ধীরগতি জীবন। শরীরের মধ্যে যেন বিকেল হয়ে এল। এখন সেই সময়, যখন তার অফুরান ছুটি, আর সে তার ব্যালকনিতে ইজিচেয়ারে বসে রাস্তার চলমান দৃশ্য দেখে যাবে, কোনও দৃশ্যের মধ্যে আর রাখবে না নিজেকে। চটপটে অরুণের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে তাই তার কষ্ট হচ্ছিল, হাঁফ ধরে গেলে সে বলল, আঃ অরুণ, আস্তে হাট।

কয়েক পা এগিয়ে-থাকা অরুণ পিছু ফিরে চায়, তুই শালা মেদিয়ে গেছিস। কোথায় সেই চটপটে লেফট আউট! কোথায় তোর কুইক রিফ্লেক্স! হা হা করে খোলা রাস্তাতেই হাসে অরুণ, তুই কি বুড়ো?

না। মাথা নাড়ে শ্যাম, আমার কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই। মনে মনে সে গুনগুন করে, থেমে গেলেই তুমি দুয়ো...থেমে গেলেই তুমি বুড়ো... থেমে গেলেই তুমি মাটির ঢেলা...কাকে কবে কোথায় যেন বলেছিল শ্যাম!

চমৎকার সাজানো-গোছানো রিসেপশন রুমে তাকে বসিয়ে রেখে ভিতরে চলে গেল অরুণ। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সেই ঘরে গদির সোফায় বসে রইল শ্যাম, তার আশেপাশে আরও কয়েকজন লোক, রিসেপশন কাউন্টারের ওধারে একটি মেয়ে টেলিফোন আর ভিজিটর নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। ঠিকই বলেছিল অরুণ মেয়েটি বড় সুন্দর। কাঁধ থেকে দীর্ঘ দু'খানা শূন্য সাদা হাত মদরঙের কাঠের পালিশে ছায়া ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে–টেলিফোনের চাবির বোর্ড থেকে খোলা কাগজে, নোট-বইয়ে। গাঢ় বেগুনি রঙের ব্লাউজ, গাঢ় বেগুনি তার শাড়ি, ফাঁপানো চুল ঘাড়ের নীচে আলগা একটা ফিতের গিট দিয়ে বাঁধা। মুখের ধাঁচ গোল, কপাল-ঢাকা চুল, ছোট্ট একটু সিঁথি। ফুটফুট করছে তার মুখ-চোখ।-সেই মুখ-চোখ কথা বলছে নিঃশব্দে–আমি খুব বেঁচে আছি। দেখো, রাতে আমি নিঃসাড় ঘুমিয়েছি। জানো, আমার এখনও বয়স হয়নি। আমার কোনও অসুখ নেই। আমি ভোরে স্নান করি, ডুব দিয়ে! আমি তোমাদের অচেনা।

আর তার একটু অনিশ্চিত চোখ আর নগ্ন দুটি হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্লান্তিহীন টেলিফোনের চাবি থেকে নোট-বই, খোলা কাগজ এবং আবার টেলিফোনে। দু'টি কাজের হাত তার স্বয়ংক্রিয়। তবু শ্যাম দেখে, যেন পিয়ানোর চাবি ছুঁয়ে যাচ্ছে।

শ্যামের আশেপাশে যারা বসে ছিল, তারা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও কাজে এসেছে, তাই একটু পরে পরে প্রত্যেকেরই ডাক এল। ভিতর থেকে, এবং এইভাবে আস্তে আস্তে

তার আশপাশ খালি হয়ে গেল। একসময়ে দেখল *ম যে, সে একা বসে আছে। আর রিসেপশনের মেয়েটি তার অত ব্যস্ততার মধ্যেও মাঝে মাঝে তাকে লক্ষ করছে।

খুব অবাক হয়ে শ্যাম টের পায়, তার বুকের মধ্যে রেলগাড়ির সেই স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার শব্দ–ধীর থেকে দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। সামান্য তেষ্টা পাচ্ছিল তার। পকেটে হাত দিয়ে দেখল সিগারেট নেই। কাচের দরজা ঠেলে দু'টি চটপটে মার্কিন ভদ্রলোক ঘরে আসে, কাউন্টারের সামনে দাঁড়ায়, নিচু স্বরে কী একটু রসিকতা করে। মেয়েটি হেসে তার সপ্রতিভ চোখেমুখে জবাব দিয়ে দেয়। আবার শূন্য হয়ে যায় ঘর। কিছু একটা লিখে রাখতে গিয়ে কোনও ভুল ধরা পড়ায় মেয়েটি জিভ কেটে পরিষ্কার বাংলায় বলে এঃ মা! চকিতে একপলক শ্যামকে লক্ষ করে চোখ নামিয়ে নেয়। টেলিফোন শব্দ করে উঠলে অবলীলায় টেলিফোন তুলে নিয়ে তুখোড় ইংরিজিতে বলে ও, বোস...মিস্টার বোস!...ইয়েস মিস্টার বোস...হিয়ার হি ইজ... থ্যাঙ্ক ইউ। আবার চকিতে চোখাচোখি হয়ে যায়।

আস্তে আস্তে অস্বস্তি পেয়ে বসে শ্যামকে। সে এই প্রথম টের পায় অনেক দিন হয়ে গেল সে আর নিজেকে সাজায় না। অযত্নের বাগানের মতো বন্য হয়ে গেছে তার শরীর, পুরনো পুথিপত্রের মতো ঝুরঝুরে হয়ে গেছে চোখের চাউনি। এন্ডির চাদরের তলায় তার স্খলিত হাত আর পেট থেকে বুক পর্যন্ত সন্তর্পণে নিজেকে পরীক্ষা করে দেখে না, কোনওখানে নেই সেই পুরনো শ্যাম। বস্তুত তার মনে হয় এই-যে লোকটা সে–এন্ডির চাদর গায়ে গালে দাড়ি, ভিতরে অস্থির এক রেলগাড়ির পুল পেরিয়ে যাওয়ার গুম গুম শব্দ একে কোনওকালে কখনও চিনত না শ্যাম। ওই মেয়েটির সামনে ধরা-পড়া অসহায় এক অচেনা লোক বসে আছে।

কী ভাবছ তুমি? আমি বাইরের দুপুরের রোদ এড়াতে কৌশলে তোমাদের এই ঠান্ডা সুন্দর ঘরে ঢুকে বে-আইনিভাবে বসে আছি? কিংবা আমি বদমাশ, তোমাকে সুন্দর দেখে তোমার মুখোমুখি বসে আছি, সময়মতো হয়তো বা পিছু নেব? কিংবা আমি যে চোর-জোচ্চোর মতলববাজ নই, সে-সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত হতে পারছ না? শ্যাম মনে মনে

এইসব কথা বলে মেয়েটিকে। যেন বা একা একটি ঘরে সুন্দরী মেয়েটির মুখোমুখি তাকে বসিয়ে রেখে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

সে সহ্য করতে পারে না। সামনের টেবিলে রাখা এক তূপ পত্রপত্রিকা থেকে একটা ছবির কাগজ তুলে নিয়ে তার ওপর মুখ নিচু করে রাখে। সিগারেট নেই-সেকথা ভুলে গিয়ে পকেটের দিকে হাত বাড়াতেই চটাস করে শব্দে হাত পা কেঁপে ওঠে তার।

এইসব ছোটখাটো অথচ গুরুতর ঘটনা ঘটে যেতে থাকলে শ্যাম প্রাণপণে চেষ্টা করে মেয়েটার দিকে আর না-কানোর। কিন্তু তারপর একটা সময় এল যখন আর ভিজিটর আসছিল না, টেলিফোনেও আর কোনও শব্দ নেই, শূন্য ঘরে মেয়েটি ও সে দুরন্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে বসে ছিল।

তারপর টেলিফোনের ক্র্যাডল থেকে রিসিভার তোলার শব্দ, তারপর দ্রুত ডায়াল করবার মিষ্টি শব্দ হচ্ছিল। তখন মেয়েটি ব্যস্ত আছে ভেবে সন্তর্পণে একবার চোখ তুলেই ভয়ংকর চমকে উঠল শ্যাম। মেয়েটি বাঁ হাতে টেলিফোনটা কানের কাছে ধরে রেখেছে, ডান হাতে সামনের রিসেপশন কাউন্টারে একটা হলুদ পেনসিল ধরে আছে, কিন্তু সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে শ্যামের দিকে। চোখে পড়তেই সে পেনসিলটা রেখে দ্রুত তার ডান হাত তুলে মাউথপিসটা চাপা দিল, পরমূহুর্তে সে পাখির মতো তীক্ষ্ণ মিষ্টি গলায় সোজা তাকে প্রশ্ন করল, হুম ডু ইউ ওয়ান্ট, প্লিজ?

মাথার ভিতরে হঠাৎ ঘোলা জল টলমল করে ওঠে। কাকে চাই! আমি কাকে চাই! তীব্র আবেগে থরথর করে শ্যামের হাত-পা কেঁপে ওঠে। মুহূর্তেই ভুলে পেয়ে বসে তাকে। মনে পড়ে না কাকে চাই, কিছুতেই তার মনে পড়ে না। শুধু মনে হয় এতক্ষণ এইখানে–এই সুন্দর সাজানো-গোছানো ঘরে সুন্দর মেয়েটির মুখোমুখি বেমানান বসে থেকে সে এদের শৌখিন সুন্দর কোনও আবহাওয়াকে নষ্ট করে দিচ্ছিল–বাস্তবিক সে কেন এখানে বসে আছে? কেন বসে আছে?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল শ্যাম। তার গলা আটকে আসছিল। শুধু মাথা নেড়ে জানাল, না, সে কাউকেই চায় না। সে কারও জন্য বসে নেই। এখানে তার কোনও কাজ নেই।

দরজার দিকে কয়েক পা হেঁটে যায় শ্যাম। দাঁড়িয়ে পড়ে। ভয়ে শিউরে ওঠে তার গা। লক্ষ করে, হাঁটবার সময়ে দরজাটা সরে যাচ্ছে। বাঁ থেকে ডাইনে। আবার বাঁয়ে। বড় অদ্ভুত! শ্যাম দ্রুত চোখ বুজে ফেলে। আবার হেঁটে যায় কয়েক পা। চোখ খুলে দেখে সে কাউন্টারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি ভ্রূ সামান্য তুলে তাকে দেখছে। যেন প্রশ্ন করতে চায় তুমি কে?

আমি কে! স্মৃতিহীন নির্বোধ শিশুর মতো শ্যাম অবাক চোখে অচেনা চার দিকে চেয়ে দেখে। বড় অসহায়ের মতো হাত বাড়িয়ে একটা চেয়ারের হাতল কিংবা একটা টেবিলের কিনারা খোঁজে সে। তার ঠোঁট নড়ে ওঠে, সে বিড়বিড় করে বলে, প্রশ্ন কোরো না আমি কে! আমি জানি না। বৃষ্টির জলের মতো দুঃখে তার বুক ভরে ওঠে—আমি জানি না আমি কেন গাছ হয়ে জন্মাইনি! জানি না আমি মাছ হয়ে জন্মালেই বা কী ক্ষতি ছিল।

চেয়ার থেকে ধীরে উঠে দাঁড়ায় মেয়েটি, লে' মি হেলপ ইউ!

বুকের ভিতরে আর্তস্বরে কথা বলে শ্যাম, না। আমাকে ছুঁয়ো না। মুখে কথা ফোটে না, তাই সে কেবল মাথা নাড়ে না। তারপর এক-পা এক-পা করে পিছু হেঁটে যায় শ্যাম। কাচের পাল্লায় হাত রাখে। সাদা মুখে ঘাবড়ে যাওয়া মেয়েটি তার দিকে চেয়ে থাকে।

পাল্লা ঠেলে বোদ আর লোকজনের ভিতরে বেরিয়ে আসে শ্যাম। ফুটপাথে দাঁড়িয়েও সে বিড়বিড় করে বলে, প্রশ্ন কোরো না আমি কে! আমি জানি না।

তারপর শ্যাম হঠাৎ 'ইয়াঃ' বলে হেসে ওঠে। মাথা নাড়ে-না, কোনওখানেই নেই লুকিয়ে থাকবার নিরাপদ জায়গা, কিংবা পালিয়ে যাওয়ার সহজ পথ। সব জায়গাতেই তার জন্য অপেক্ষা করছে ওই প্রশ্ন, তুমি কে!

না, শ্যাম জানে না। শ্যাম সত্যিই জানে না।

.

অনেকক্ষণ বাদে তার ফেরানো পিঠে হাত রাখল অরুণ, কী ব্যাপার! বাইরে কেন?

এমনিতেই! শ্যাম ম্লান হাসে।

ভিতরে তোকে খুঁজে না পেয়ে চমকে গিয়েছিলুম। শেষে রিসেপশনের মেয়েটি দেখিয়ে দিল যে, তুই বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস। বলে সুন্দর ঠোঁটের কোনায় একটু হাসি সঁতে কামড়ে ধরল অরুণ, দেখলি!

কী?

অরুণ বড় চোখে তাকায়, তোমাকে আমি চিনি না শালা! আমি ইচ্ছে করেই দেরি করছিলুম, ঠিক জানতুম তোর এক্স-রে আই, এ-ফেঁড় ও-ফেঁড় করে দেখে নিবি! তবে এটা তেমন নয়, বুঝলি! মিস দত্ত আরও হট! এ নতুন। বলতে বলতে চিকমিক করে ওঠে অরুণ, আলাপ করবি? আমার সঙ্গে কয়েকদিনের যাতায়াতেই খুব খাতির। নাম– লীলা ভট্টাচার্য। কবি আলাপ?

না। শ্যাম মৃদু হেসে মাথা নাড়েনা।

শ্যাম ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দরজার কাচের পাল্লা দিয়ে রাস্তা থেকেও মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে। মেয়েটির কৌতুহলী চোখ আবার তার চোখে পড়ল। শ্যাম ঘাড় ফিরিয়ে নেয়।

কী হল তোর শ্যাম! জিভ দিয়ে চিকচিক একটা শব্দ করে অরুণ।

কী জানি! হাঁটতে হাঁটতে শ্যাম বলল, কোনওখানে কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে আমার।

ভ্রূ কুঁচকে অরুণ বলে, কী রকম?

হাইস্কুলে পড়ার সময় মেয়ে দেখলে যেমন হত, অনেকটা সেরকম নার্ভাস বোধ করছিলুম। মেয়েটি জিজ্ঞেস করল আমি কাউকে চাই কি না। অমনি মনে হল ওখানে বসে থেকে আমি অন্যায় করছি, চোরের মতো উঠে এলুম। অথচ এর চেয়েও কত তুখোড় কেওয়ালা জায়গায় আমি অনায়াসে গেছি সেদিনও, কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে এরকম মেয়েদের বলেছি 'হেল্লো' ...

জিজ্ঞাসার চোখে শ্যামের দিকে তাকায় অরুণ।

গোলমাল হয়ে গেছে। শ্যাম মাথা নাড়ে, অনেক দিন বাদে আমি টের পেলুম যে, আমি প্রেমে পড়ে যেতে পারি।

লীলার?

না। লীলা বলে নয়। যে-কোনও মেয়ের। আশ্চর্য! এতকাল যখন বৃন্দা মাধবী কিংবা ইতুর সঙ্গে ঘুরেছি, শুয়েছি এক বিছানায়, আগাপাশতলা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি ভাল লাগার মতো কিছু পাওয়া যায় কি না, তখনও আমার বুকের মধ্যে রেলগাড়ির শব্দ হয়নি কখনও। মনে হয়নি যে, এর মধ্যে কোনও রহস্য আছে আর। মনে হয়, কোনও কিছুই বাকি রাখিনি বলে আমার ঠিক তৃপ্তি কখনও হয়নি। বুকের কাছে কোথাও একটা দুঃখ চাপ বেঁধে আছে।

কী-সব বলছিস রে?

ঠিক বলছি। শ্যাম মাথা নিচু রেখে বলে, কে যেন বলেছিল, ঈশ্বরজ্ঞান না হলে মেয়েদের ঠিকমতো চেনা যায় না! কে বলেছিল বল তো!

কী জানি! ঠোঁট ওলটায় অরুণ, রামকৃষ্ণ-কৃষ্ণ কেউ হবে!

হবে।

একটু চিন্তিতভাবে মৃদু হাসে অরুণ, এক লীলা ভটচাযই তোকে ঈশ্বরজ্ঞান দিয়ে দিল আধ ঘণ্টায়!

না। শ্যাম হাসে, আমি শুধু এটুকু বুঝলুম যে, আমার ভিতরে এখনও এত আশ্চর্য রেলগাড়ির শব্দ আছে, আর আছে অতৃপ্তি। মনে হয় মেয়েরাই আমাকে ঠকিয়েছে সবচেয়ে বেশি। সবকিছু নিয়েও আসল রহস্যটুকু আঁচলে বেঁধে নিয়ে গেছে। কিবা কী জানি, হয়তো সে-রহস্যও আমার সামনে খোলা চিঠির মতো মেলে-ধরা ছিল। আমি ধরতে পারিনি। তাই মেয়েটা যখন প্রশ্ন করল আমি কাউকে চাই কি না তখন হঠাৎ নিজেকে ভিখিরি বলে মনে হল, মনে হল আমার নাম-পরিচয় নেই। আমি এত তুচ্ছ ইনসিগনিফিক্যান্ট যে, আমার জন্ম না-হলেও কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলুম না, আমি গাছ হয়ে কেন জন্মাইনি, আমি কেন হইনি জলের মাছ?

ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ল অরুণ, শ্যাম!

কথা বলিস না অরুণ। শ্যাম আস্তে বলল, আমি নিজেকে এতকাল ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট ভেবে এসেছি। আমার সবকিছুই খুব সহজে পাওয়ার কথা–আমি ভেবেছিলুম। শ্যাম মৃদু হেসে মাথা নাড়ে, যা পেয়েছিলুম তা ভুল। আমাকে এতকাল সবাই ঠকিয়ে এসেছে। নইলে কেন আমার বুকের ভিতরে এখনও রেলগাড়ির শব্দ? আমি কেন মাঝে মাঝে দরজা খুঁজে পাই না? গাছের ছায়া খুঁজে পাই না? কোথায় ভুল হচ্ছে? এতকাল তো আমার সব দরজাই ছিল চেনা, সহজে খুলেছি...হঠাৎ ভালবাসার জন্য আবার আমার হাঁটু গেড়ে বসতে ইচ্ছে করছে।

চোখ কপালে তোলে অরুণ, কী ব্যাপার বল তো!

ক্লান্তভাবে হাসে শ্যাম, কিছু না।

ধুস শালা! অরুণ হো হো করে হাসে, হাসতে হাসতে নিজের পেটের দিকে আঙুল দেখায়, সবকিছুর মূলে ওই পেট! বায়ু থেকেই তোর সবকিছু হচ্ছে। রোজ রাতে ইসবগুলের ভূষি

খাবি, সকালে উঠে গরমজলে লেবুর রস। আমি যখন ব্যাচেলর ছিলুম তখন আমার পেটের কমপ্লেনই ছিল এগারো রকমের...লীলা ভটচাযকে আমি বলে রাখব যে, তুই সেইন্ট অ্যান্ড মিলারের এক্স-ছোটসাহেব। ভাল খেলোয়াড়– উভয়ার্থে। বলে রাখব যে, তুই দাড়ি না কামিয়ে এভির চাদর গায়ে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, ভুল করে যেন তোকে ছেড়ে না দেয়।...

.

এসপ্ল্যানেডে ফুটপাথে সঁড়িয়ে হাত তুলে 'হেঃ ট্যাক্সি...' বলে ট্যাক্সি দাড় করায় অরুণ। শ্যামকে বলে, চ তোকে পৌঁছে দি।

হাই তোলে শ্যাম, বলে, না। বাসায় ফেরার তাড়া নেই। আমি একটু ঘুরে-ফিরে যাব। তুই যা।

ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করার আগে অরুণ নিচু গলায় বলল, যদি মনে ধরে থাকে তো লেগে যা। আমি দেখব।...চাকরির জন্য ভাবিস না শ্যাম, আমার শ্বশুরের ফার্ম, আমি যাওয়ার আগে বুড়োকে পগিয়ে যাব, তোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বলতে বলতে ভীষণ বদমাশের মতো হাসে অরুণ, শরীরটা কেমন দেখছিস আমার? ভাল না?

আঃ ফাইন! শ্যাম হাসে।

ফর অ্যামেরিকা, দি ল্যান্ড অব ফ্রি সেক্স! দেখিস, ষাট বছর বয়সেও আমি শরীর রেখে দেব। চিয়ারিও...

চলন্ত ট্যাক্সি থেকে হাত দেখায় অরুণ। বিদেশি এক অরুণ, যাকে ঠিক ঠিক চেনে না শ্যাম, অথচ চেনা বলে মনে হয়!

শূন্য মনে হেঁটে যায় শ্যাম। তার মাথার মধ্যে ভ্রমরের শব্দের মতো দূরাগত এক মোটর-সাইকেলের আওয়াজ ঘুরে বেড়ায়। অস্থির বোধ করে সে। খ্রিসমাসের জন্য সাজানো

দোকানপাট, রঙিন কাগজের শেকল, বুড়ো সান্টা ক্লস আর নকল পাইন গাছ চোখের পাশ দিয়ে সরে যায়। হ্যান্ডবিলে বিজ্ঞাপন বিলি করছে একটা লোক, শ্যামের হাতেও সে একটা কাগজ গুঁজে দেয়। তাতে ইংরিজিতে বড় হরফে লেখা, আপনার বিপদ কেটে গেছে…তারপর একটা ওষুধের গুণ-বর্ণনা। মৃদু হেসে কাগজটা দুমড়ে ফেলে দেয় শ্যাম। মনে মনে গুনগুন করে শাম, আঃ আমার বিপদ কেটে গেছে! বিপদ আর নেই!

৮. সেকেন্ড ক্লাস ট্রামের জানালার

ফিরবার সময়ে সেকেন্ড ক্লাস ট্রামের জানালার ধার ঘেঁষে বসা একটা লোক মাথা নিচু করে তাকে আদাব দিল। পরনে পায়জামা, লক্ষৌ-এর কাজ করা পাঞ্জাবি আর মাথায় মোটা সুতোয় বোনা নেট-এর একটা গোল টুপি, যা মাথার সঙ্গে চেপে বসেছে। চোখে সুর্মা। ইরফান!

ইরফান! কেমন আছ!

শ্যাম ট্রামে উঠতেই লোকটা খুব বিনয়ের সঙ্গে হেসে উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা ছেড়ে দিল, বসুন চক্রবর্তীবাবু।

শ্যাম বসল না, ইরফানের কাধে আলতো করে হাত ছুঁইয়ে বলল, আরে তুমি বোসো।

বোসো। ইরফান মৃদু হেসে বলে, আপনি বসুন, আমি পার্ক স্ট্রিটে নেমে যাব।

শ্যাম ক্লান্তভাবে বসে হেসে বলল, কী খবর?

ইরফানের মুখে আবার সেই বিনয়ের হাসি, আজকাল আসেন না আর।

না, অনেককাল শ্যাম আর যায় না রাজাবাজারের ইরফানের কাছে। যাওয়ার দরকার হয় না। আগে প্রতি মাসে যেতে হত। আড়াইশো টাকা জমা দিলে ইরফান তার ঢাকার এক আত্মীয়কে চিঠি লিখে দিত–”আমাদের দক্ষিণের বাগানে এবার খুব আম হইয়াছে। বানিখাড়ার কমলাক্ষ চক্রবর্তীকে দুইশত আম পাঠাইয়া দিবেন।” আর বাবা ঠিকঠাক দুই শ’ টাকা পেয়ে যেত ওখানে।

কাজ-কারবার কেমন! শ্যাম জিজ্ঞেস করে।

মন্দা। হুন্ডি ধরে ফেলেছে। নিচু গলায় বলে ইরফান। হাসে, এখন কারবার সাহাবাবুদের হাতে আর ঢাকার মাড়োয়ারি।

কোনও কথাই ভাল করে শুনছিল না শ্যাম। একটা অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছে ট্রাম, হু হু করে হাওয়া লাগে। শ্যাম বয়স্ক ইরফানের সুর্মা-টানা সঙের চোখের মতো চোখে চোখ রেখে চেয়ে থাকে। ভদ্রতার হাসি হাসে।

পার্ক স্ট্রিটে নেমে গেল ইরফান। নামার আগে হঠাৎ কানের কাছে মুখ এনে বলল, যদি পাকিস্তানে যাওয়ার দরকার পড়ে তো বলবেন। হাতে ভাল এজেন্ট আছে, বর্ডার পার করে দেবে, আবার দশদিনের মাথায় ফিরিয়ে আনবে। কোনও ভয়-ডর নেই। বলবেন।

পার্ক স্ট্রিটে নেমে গেল ইরফান। যাওয়ার সময়ে আবার আদাব দিল রাস্তা থেকে।

ইরফান নেমে গেলে হঠাৎ শ্যামের মনে পড়ল যে, লোকটা মুসলমান। মনে পড়ল যে, সে হিন্দু। আশ্চর্য! সে যে হিন্দু এ-কথাটা অনেক দিন হয় তার খেয়ালই ছিল না। মনে পড়েনি-আমি হিন্দু। মনে পড়তেই শ্যাম সামান্য হেসে ওঠে—আশ্চর্য, আমি হিন্দু! কেমন হিন্দু আমি! হিন্দু হয়ে আমি কেমন আছি।

অনেক ভেবেও শ্যাম শব্দটার কোনও অর্থ খুঁজে পেল না। অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, সে হিন্দু। সে ভারতীয়। কিংবা সে বাঙালি। অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, সে কমলাক্ষ চক্রবর্তীর ছেলে, সাকিন-বানিখাড়া, ঢাকা জেলা। অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, শ্যাম চক্রবর্তী নামে কেউ সেইন্ট মিলারের প্রাক্তন ছোটসাহেব, কিংবা...ক্লাবের এককালের লেফট আউট! অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, এইসব নাম-পরিচয়ের মধ্যে সে বাঁধা আছে। অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, এইসব নাম-পরিচয়ের বাইরে তার আর কোনও অস্তিত্ব নেই!

.

কুয়াশার ভিতর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ট্রাম, ময়দান পেরিয়ে যাচ্ছে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয়। শ্যাম জানালার কাঠে মাথা হেলিয়ে দেয়। তারপর ক্রমে লক্ষ্য ভুলে গিয়ে তার ট্রামগাড়ি অচেনা অজানায় পাড়ি দেয়। চারদিকে চাঁদ আর কুয়াশার মায়া, হু হু করে কেঁদে ওঠে প্রকাণ্ড নিষ্ফলা মাঠ, গাছের ভুতুড়ে ছায়া পাথরের মতো জমে আছে।

টিকিট!

বিরক্ত শ্যাম হাত তুলে কন্ডাক্টরকে সরে যেতে বলে। কন্ডাক্টর সরে যায়।

মায়াবী ট্রামগাড়ি চেনা পথ ছেড়ে দিয়ে বেঁকে যায়, ঘুরে যায় অচেনায়। গাছপালা ডেকে ওঠে, এসো শ্যাম! বাতাস ফিস ফিস করে বলে, এসো শ্যাম! তারপর তাকে ছুঁয়ে আনন্দে বাতাস ছুটে যায় গভীরতর রাজ্যের ভিতরে পাহাড়ে, গুহায়, নদী কিংবা সমুদ্রের ওপর দিয়ে সুগন্ধের মতো ভেসে যায় সুসংবাদ–শ্যাম, আমাদের শ্যাম। মাটিতে পা রাখতেই মায়ের মতো মাটি ডেকে ওঠে, শ্যাম! পাখির চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া জলের মতো শিশির জমে আছে ঘাসে। কালকাসুন্দির ঝোপে, কুলবড়ই গাছের তলায়, কুয়োর পাড়ে আতাবনে বাদুড়ের মতো ঝুলছে অন্ধকার, চকমক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে জোনাকি পোকা। নোনাপুকুরের আঁশটে গন্ধ পায় শ্যাম, শাপলার গায়ের গন্ধ, নিথর রাতকে চমকে দিয়ে জলে ঘাই দেয় বড় মাছ, তারপর শান্ত জলের নীচে পরিদের গভীর রাজ্যে চলে যায় তার অতিকায় নিঃশব্দ গতিময় ছায়া।

দূরে গঙ্গায় বেজে ওঠে জাহাজের ভোঁ। মাথার ওপর উড়োজাহাজের বিষণ্ণ শব্দ। শ্যাম অন্যমনে সাড়া দেয়, যাই।

ময়দানের পাশ ঘেঁষে যেতে যেতে মাত্র কয়েক পলকের জন্য স্বপ্নের সেই দেশ শ্যামের চেতনাকে ছুঁয়ে গেল।

ক্লান্ত শ্যাম ট্রাম থেকে নেমে ধীর পায়ে পেরিয়ে গেল গড়িয়াহাটার মোড়। তার গা ঘেঁষে বুড়ো গেঞ্জিওয়ালা উলটো দিকে হেঁটে যায়, ধীর গম্ভীর স্বরে হাঁকে, গেঞ্জি...!

কয়েক পা হেঁটে যায় শ্যাম, তারপর শোনে হতাশ এক গেঞ্জিওয়ালা স্বর টেনে চলেছে– গেঞ্জি...! দূরে চলে যাচ্ছে সেই ডাক। মাথার ভিতরে হঠাৎ আবার টলমল করে ওঠে ঘোলা জল, কিন্তু মনে পড়ে না, মনে পড়ে না–

আবার কয়েক পা হেঁটে যায় শ্যাম, তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ে, অস্ফুট গলায় বলে ওঠে, সোনাকাকা!

ঘুরে দাঁড়িয়ে ভিড় ঠেলে উজিয়ে আসতে চেষ্টা করে শ্যাম। কিন্তু ততক্ষণে বহুদূরে চলে গেছে। গেঞ্জিওয়ালার ওই ডাক। শ্যাম মাথা নেড়ে আপনমনে বলে, আঃ, সোনাকাকা!

তার মনের মধ্যে বুড়ো মুখ তুলে ছানি-পড়া চোখে বে-ভুল চেয়ে থাকে সোনাকাকা, অঃ মনু! মাথা নেড়ে বলে, মনু রে!

তার কাঁধে হাত রাখে শ্যাম, সোনাকাকা, বাইচ্যা থাইকো। আরও কিছুদিন বাইচ্যা থাইকো। বিড় বিড় করে কথা বলে শ্যাম, আমি নিয়ে আসব সুদিন। অপেক্ষা করো।

হোটেলে মিত্রর সঙ্গে দেখা হলে মিত্র চোখ কপালে তুলে বলল, আজ একটা কাণ্ড হয়ে গেল মশাই, ভালবাসার ব্যাপার, খুব ইন্টারেস্টিং...

শ্যাম ভ্রূ তুলে হাসল, বটে!

মিত্র ঝুঁকে বলল, মেয়েটা কুমারী থেকে এক লাফে বিধবা হয়ে গেছে। ডবল প্রমোশন।...মাঝখানে মাসখানেক আসেনি, আজ এল, পরনে সাদা থান, হাতে চুড়ি নেই, কানে দুল, গলায় হার নেই, মুখ-চোখ থমথম করছে। আমরা তো প্রথমে কিছু জিজ্ঞেসই করতে পারি না, এ ওর মুখ চাই–এই সেদিনকার কুমারী মেয়ে, বিয়ে হয়নি, হঠাৎ এ কী? জিজ্ঞেস করতেই প্রথমে কেঁদে ভাসাল, বলল, আমি বিধবা। আমার স্বামী মারা গেছে।...কিন্তু বিয়ে হল কবে? জিজ্ঞেস করলে কেবল মাথা নেড়ে বলে, হয়েছিল।...কিন্তু কবে? অনেক কষ্টে তারপর মুখ ফুটল মেয়ের, বিয়ে হয়নি, কিন্তু হয়ে যেত। আমি মনে

মনে ওকে স্বামী বলে জানতুম, আর কেউ কখনও কোনও দিন আমার স্বামী হবে না...শুনলুম ছোকরা অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে মশাই...।

বলতে বলতে মিত্র গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ, বলল, অদ্ভুত ব্যাপার মশাই, এই ভালবাসা! কী বলেন?

শ্যাম হাসে। হঠাৎ তার মাথার ভিতরে আস্তে জেগে ওঠে ভ্রমরের শব্দের মতো মোটর সাইকেলের আওয়াজ। অ্যাকসিডেন্ট! কীরকম অ্যাকসিডেন্ট?

মিত্র অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, কী জানি, আজকাল লোকে বলে ভালবাসা-টাসা আর নেই, সব অ্যাডজাস্টমেন্ট! আমারও সেইরকম বিশ্বাস এসে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ আজ পুরনো ঘায়ে খোঁচা। লেগেছে মশাই! খুব মজা করলুম বটে অফিসে ব্যাপারটা নিয়ে, কিন্তু মনটা ভার হয়ে আছে। ভিতরে ভিতরে একটা হেমারেজ টের পাচ্ছি।

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়। খাওয়া হয়ে গেলে আঁচিয়ে এসে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে দু'জনে। চলে যাওয়ার আগে মিত্র হঠাৎ বলল, দেখুন, আমাকেও কীরকম বিধবা করে রেখে গেছে একজন। পুরুষ বলে থানটা পরিনি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে...না মশাই, হাসবেন না, কিন্তু এক-একদিন নিরালা ঘরে বসে খুব কাঁদতে ইচ্ছে করে।

.

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে শ্যাম টের পেল রাস্তা দিয়ে একজন হকার গেঞ্জি' হাঁকতে হাঁকতে চলে যাচ্ছে।

এত রাতে? মনে হতেই লেপ সরিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল শ্যাম। বাঁ দিকে চেয়ে দেখল– রাস্তা শূন্য। ডান দিকে চেয়ে দেখল-রাস্তা শূন্য। তবু বহু দূর দূর থেকে দূরে রাতের গভীরে চলে যাচ্ছে ওই ডাক–গেঞ্জি...গেঞ্জি...।

সোনাকাকা! নিজের কান চেপে অভিভূত শ্যাম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর আস্তে আস্তে আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখল শ্যাম। নিথর কালপুরুষ, ছায়াপথ, নক্ষত্রমণ্ডলী। আর সেই হিম আকাশে, নক্ষত্রে, তারা থেকে তারায়, ছায়াপথ পেরিয়ে রোগা, বুড়ো, প্রায়-অন্ধ সোকাকা ফেরি করতে করতে চলে যাচ্ছে তার সওদা-গেঞ্জি...গেঞ্জি...!

৯. মোটর-সাইকেল দুর্ঘটনা

তেইশ ডিসেম্বর মোটর-সাইকেল দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তি আজ হাসপাতালে মারা গেছেন—এ-রকম একটা খবর পর পর কিছুদিন পত্রিকায় খুঁজে দেখল শ্যাম। নেই। নেই। অথচ প্রতিদিন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে দুর্ঘটনার খবর থাকে। কতভাবে যে মরে যাচ্ছে মানুষ ইঁদুর আরশোলা কিংবা রোজ জল-না-পাওয়া চারাগাছের মতো তা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। এইভাবে মরে মরে যদি পৃথিবীর ভিড় কমে যায়! যদি আস্তে আস্তে নির্জন হয়ে আসে পৃথিবী! ভাবতেই শ্যামের চোখে-মুখে আনন্দে। রক্তোচ্ছ্বাসের ঝাপটা এসে লাগে। তখন বড় সুন্দর হবে এই শহর, আরও রহস্যময়ি হবে পৃথিবী। তখন সব মানুষই হয়ে যাবে সব মানুষের চেনা পরিচিত আত্মজন। ভালবাসায় ভরে উঠবে পৃথিবী। থাকবে না প্রতিযোগিতা, আক্রমণ লোপ পাবে, তখন মানুষের ভাষা থেকে লুপ্ত হবে গালাগাল, অশ্লীল কিংবা কঠিন শব্দ। তখন দূরের মহাদেশ নিয়ে রূপকথার গল্প জমবে খুব। তখন আরও পাখি, প্রজাপতি ও উদ্ভিদের জন্ম হবে পৃথিবীতে। পরিষ্কার সুগন্ধি বাতাস বয়ে যাবে। তখন পাওয়া যাবে দূরের শব্দ কিংবা গন্ধ, আর নিজেকে পাওয়া যাবে হাতের মুঠিতে। অল্প কিছু লোকের ভিতর থেকে সহজেই বেছে নেওয়া যাবে কয়েকটি বন্ধু, কিংবা নিজের স্ত্রীকে, আলাদা করে চেনা যাবে ভাড় কিংবা শয়তানকে, এখনকার মতো সব গোলমেলে মনে হবে না।

কিংবা যদি আরও নির্জন হয়ে যায় পৃথিবী! যদি ক্রমে ক্রমে জনশূন্য হয়ে যায় শহর, প্রান্তর, মহাদেশ! সমস্ত পৃথিবীতে আর একটিও মানুষ বেঁচে নেই একমাত্র শ্যাম ছাড়া!

ভাবতে ভাবতে শ্যাম ঘরের মেঝেয় ছড়ানো সিগারেটের টুকরোর ওপর পা ফেলে দ্রুত পায়চারি করে, লাথি মেরে সরিয়ে দেয় একটা বই, জ্বরো রুগির মতো নিজের লম্বা জট-পাকানো চুল চেপে ধরে ‘উঃ’ বলে হেসে ওঠে, আয়না তুলে ধরে নিজের খেপাটে অচেনা মুখের সামনে। তঁা, তখন? মানুষের তৈরি কলকারখানাগুলি গভীর ঘাসের সবুজে ডুবে

যাবে, রেল-ইঞ্জিনগুলি জং ধরে আস্তে আস্তে মিশে যাবে মাটিতে, জাহাজ গলে জল হয়ে যাবে, এরোপ্লেনের গা জড়িয়ে উঠবে মাধবীলতা, উঁচু উঁচু বাড়িগুলির মাথায় জাতীয় পতাকার মতো উড়বে অশ্বত্থের পাত, আমাদের কাঠের আসবাবগুলি আবার উদ্ভিদ হয়ে যাবে। একটি মানুষের জন্য থাকবে একটি সূর্য, একটি চাঁদ, এক-আকাশ নক্ষত্র, একটি পৃথিবীময় জল-স্থল-শূন্যময় খোলা জায়গা।

নিজেকেই বিড় বিড় করে প্রশ্ন করে শ্যাম। নিজেই উত্তর দেয়।

তখন কি তোমার খুব একা লাগবে না শ্যাম?

না! শ্যাম মাথা নাড়ে, না।

তখন কাউকেই কি তোমার দরকার হবে না শ্যাম! মায়ের মতো কেউ, কিংবা বৃন্দা, মাধবী, ইতুর মতো কেউ? শিশু সন্তানের মতো কেউ? ভাইয়ের মতো কেউ?

না! শ্যাম মাথা নাড়ে, না।

যদি তুমি তখন কথা বলতে ভুলে যাও! যদি ভুলে যাও গান গাইতে। কিংবা ভুলে যাও ভাষার ব্যবহার! রতিক্রিয়া ভুলে যাবে? চিঠি লেখা? তোমাকে প্রশংসা করার লোক থাকবে না? এমন কেউ থাকবে না যে তোমাকে সুন্দর দেখে? তোমার কাছে থেকে দূরে যাওয়ার কেউ থাকবে না? থাকবে না কাছে আসার কেউ?

না! শ্যাম মাথা নাড়ে, না।

তারপর শ্যাম আস্তে হেসে ওঠে। আয়নায় নিজের মুখের দিকে চেয়ে নিজেকে একটি ধাঁধা জিজ্ঞেস করে–

বলো তো এমন একা কে? জল স্থল শুন্যময় যার অখণ্ড পরিসর! যে আত্মজনহীন! যার নেই দুরে যাওয়ার বা কাছে আসার কেউ? কে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ, শ্যাম?

শ্যাম বিড় বিড় করে বলে, আমি।

আবার খবরের কাগজ তুলে নেয় শ্যাম। হতাশভাবে মাথা নাড়ে। না, লোকটা মরেনি। হয়তো কিছু হয়নি লোকটার। সে হয়তো আড়াল থেকে শ্যামকে লক্ষ করে যাচ্ছে, অপেক্ষা করছে একটি মুহূর্তের যখন শ্যাম কোনও রাস্তার বাঁকে মোড় নেবে, তখন তার হাতের আয়নায় রোদ ঝলসে উঠে পড়বে শ্যামের মুখে।

না, লোকটা মরেনি। শ্যাম নিশ্চিত। সে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। রাস্তাটা ভাল করে দেখে নেয়। ওই তো চেনা পেট-মোটা বেঁটে লাল ডাকবাক্সটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে, ল্যাম্পপোস্টে লাগানো চৌকো বাক্সের গায়ে সিনেমার বিজ্ঞাপন, চেনা লাল হলুদ সাদা কয়েকটা বাড়ি, দত্তদের বাগানে খেলছে কাক আর সিঁড়িতে শুয়ে আছে পাঁচটা বেড়াল, দুটো ট্যাক্সি গেল পর পর, পিছনে মন্থরগতি এক ঠেলাওয়ালা, একটি-দুটি মেয়ে আর কয়েকজন শান্ত নিরীহ চেহারার লোক, সকালের রোদ চারদিকে ফসলের মতো ফলে আছে। কোনওখানেই সন্দেহের কিছু নেই, তবু শ্যাম টের পায়, এই সব কিছুর আড়াল থেকে দুটি চোখ তাকে চোখে চোখে রাখছে।

কেমন সেই লোক যার মুখে শ্যাম আলো ফেলেছিল? মিনুর মতোই নিষ্ঠুর কেউ কি? তার মুখ দেখেনি শ্যাম, লক্ষ করেনি তার গায়ের রং, জানে না সে কতটা লম্বা কিংবা তার বাড়িতে কে কে আছে, কে জানে সে সুবোধ মিত্রর অফিসের সেই কুমারী বিধবা মেয়েটির প্রেমিক কি না। কিংবা কে বলতে পারে যে লোকটা মিনু নয়! বিধবা নয় তার সঙ্গীদের একজন!

শ্যাম মনে মনে বলে, তবু পৃথিবী থেকে লোকজন ঢের কমে যাওয়া ভাল। আরও শালিক আরও চড়াই আরও উদ্ভিদের, আরও ভালবাসা, রহস্য ও স্বপ্নের বড় প্রয়োজন আমাদের।

একদিন এসপ্ল্যানেডের খোলা রাস্তায় হঠাৎ অসময়ে বৃষ্টি নামল। অকালে। গোপনে মেঘ জমেছিল আকাশে, শ্যাম টের পায়নি। হঠাৎ খেয়াল করল তার চার পাশে হরিণের খুরের

শব্দ। চরাচর জুড়ে ছুটে আসছে অজস্র অসংখ্য হরিণ। হাওয়ার সামান্য গতিতে ছুটে যাচ্ছে তার চারপাশ দিয়ে।

শ্যাম ছুটে গিয়ে দাঁড়াল একটা গাড়ি বারান্দার তলায় এক পাল লোকের ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে। ময়লা, ভ্যাপসা গন্ধওয়ালা রুমালটা পকেট থেকে বের করে বহুদিন পর কাজে লাগাল শ্যাম, চুল আর দাড়িতে জল মুছে নিল। ঠান্ডা হাওয়ায় বড় শীত করে উঠল তার। সে ভিড়ের ভিতরে একজন মোটাসোটা লোক খুঁজে দেখল যার পিছনে দাঁড়ানো যায়। নেই। পকেটে হাত দিল সিগারেটের জন্য। নেই। আর্কেডের তলায় খুঁজল একটা সিগারেটের দোকান। পেয়ে গেল। মন্থর পায়ে ভিড় ঠেলে দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াতেই ভয়ংকর চমকে গেল শ্যাম। প্রায় চার ফুট চওড়া একটা দোকান-জোড়া আয়না—অজস্র মাথা ও মুখের ভগ্নাংশ দেখা যাচ্ছে, সে নিজের সম্পূর্ণ অচেনা ভিখিরির মতো কাঙাল মুখ দেখতে পাচ্ছিল, আর দেখল পিছনের ভিড় থেকে একটি আবো-চেনা মুখ ঘাড় ঘুরিয়ে সামান্য কৌতূহলী চোখে তাকে দেখছে। একটি মেয়ে। সিগারেটের জন্য খুচরো পয়সা-ধরা বাড়ানো হাত থেমে রইল, শ্যামের বুকের ভিতরটায় হঠাৎ শূন্যতার মধ্যে চমকে ওঠে তার হৃৎপিণ্ড, রেলগাড়ির আওয়াজ শুরু হয়ে যায়।

মুখ ফিরিয়ে শ্যাম মেয়েটির দিকে তাকাতেই মেয়েটি কৌশলে অন্যমনস্কতার ভান করে সরিয়ে নিল চোখ, তারপর খুব সাবধানে, যেন বিশ্রী না দেখায় এমনভাবে, ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিল।

বয়ঃসন্ধির সময়ের মতো লাজুক হয়ে গেল তার হাত-পা। সমস্ত শরীরে কাটা দিল।

চেনে শ্যাম। মেয়েটিকে সে চেনে। কিন্তু কোথায় দেখেছিল ওই অসম্ভব সুন্দর মুখ! ওই কপাল-ঢাকা চুল, গোল মুখ, মুখে নিঃশব্দ কথা জানো আমি খুব বেঁচে আছি! আমার এখনও বয়স হয়নি। আমার কাছে অদেখা পৃথিবী অনেক বড় রয়ে গেছে দেখা-পৃথিবীর চেয়ে।

ওই মুখ কোথায় দেখেছিল শ্যাম? কবে? মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করে ওঠে। কোথায়?

পিছন থেকে কেবল মেয়েটির একটু দীর্ঘ বাঁকা ঘাড় দেখা যাচ্ছিল। সে পরেছে হালকা নীল রঙের শাড়ি, মেটে সিদুরের রঙের যার পাড়, কাশ্মীরি একটা স্কার্ফ গলায় জড়ানো। হাত দুটি বুকের ওপর মুড়ে রাখা, পিছন থেকে ভাল বোঝা যায় না, হয়তো সে বুকের ওপর কিছু একটা চেপে ধরে আছে। হয়তো তার ব্যাগটা। বোঝা যায় যে সে একা।

একটু লালচে আভার চুলের বড় খোঁপা তার, যার ওপর কয়েক বিন্দু বৃষ্টির জলে বজ্রবিদ্যুৎ আর অহংকার ফুটে আছে নিঃশব্দে।

আর-একবার তার মুখখানা দেখতে ইচ্ছে করে শ্যামের। কিন্তু মেয়েটি মুখ ফেরায় না! যেন অদৃশ্য কোনও থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এমনি অলস এবং অবহেলার ভঙ্গি তার।

খুচরো পয়সাগুলি আস্তে আস্তে পকেটে রেখে দেয় শ্যাম। মৃদু হেসে সে বিড় বিড় করে বলে, তোমাকে এমন কোথাও দেখেছি যেখানে তোমাকে মানায় না। তাই তোমাকে মনে করতে আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু দাঁড়াও, আগে ভাল করে তোমাকে দেখতে দাও

কিন্তু কাছে যেতে সাহস হয় না শ্যামের। সে ভিড়ের ভিতরে গা-ঢাকা দেয়, একটু কুঁজো হয়ে ভিড় ঠেলে এগোতে থাকে, অর্ধ চক্রাকারে ঘুরে যেতে থাকে মেয়েটির সামনের দিকে, নিজেকে মেয়েটির কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে রাখার চেষ্টা করে। ভিড়ের মধ্যে বিরক্ত মানুষেরা তার দিকে চেয়ে দেখে। শ্যাম গ্রাহ্য করে না।

বুড়ো এক পাঞ্জাবির পা মাড়িয়ে দেয় শ্যাম, বাচ্চা একটা ছেলের পিঠে হাত রেখে তাকে সরিয়ে দেয়, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথা বলছিল দুটি ছেলে, তাদের ঠেলে মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যায় সে। তার মুখ বাঁ দিকে ঘোরানো, চোখ লক্ষ্যবস্তুর ওপর স্থির। ক্রমে তার চার পাশে মানুষেরা ছায়ার মতো অলীক হয়ে আসে, যেন আর কারও কোনও অস্তিত্ব

নেই। শুধু ক্রমে ক্রমে মেয়েটির ছোট কানের ইয়ারিং থেকে গালের ডৌল, একটু চাপা নাক, ঠোঁট, ক্রমে গোল সম্পূর্ণ মুখটি চলে আসে তার চোখের নাগালে। সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ফুটপাথের ধারে চলে এসেছিল শ্যাম। তার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বৃষ্টির জলকণা, হু-হু বাতাস তার এন্ডির চাদর নিশানের মতো ওড়াতে থাকে। কনকন করে ওঠে কান। শ্যাম গ্রাহ্য করে না। একটা চোর-বেড়ালের মতো সে মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে। তার সমস্ত চেতনা জুড়ে দূরগামী হরিণের পায়ের শব্দের মতো বৃষ্টির শব্দ হয়ে যেতে থাকে।

মেয়েটির গা ঘেঁষে চলে যায় কয়েকটি পুরুষ। হাত-পা রি-রি করে ওঠে শ্যামের। কী সাহস। আবার অনেক দিন পর শ্যামের মনে হয় যে, বহুদিন হয়ে গেল সে আর নিজেকে সাজায় না। তার গালে রুক্ষ দাড়ি, মাথায় লম্বা জটার মতো জড়িয়ে থাকা এলোমেলো চুল, গায়ে ময়লা এন্ডির চাদর। সে অনেক লোগা, লাবণ্যহীন আর দুর্বল হয়ে গেছে। তার আর সেই সাহস নেই সহজেই যে-কোনও মেয়ের কাছাকাছি চলে যাওয়ার। কোথায় গেল সেই ভেলার মতো ভাসমান হালকা মন! সেই খেলার ছল। এখন তার বুকের মধ্যে সেই রেলগাড়ির স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার আর পুল পেরিয়ে যাওয়ার শব্দ। সে নিজের বুকে হাত রাখে। না, এই অচেনা রহস্যময় শ্যামকে চেনে না শ্যাম। তার শরীরের ভিতরে, মনের ভিতরে ডেকে উঠছে মেঘ, চমকে উঠছে বিদ্যুৎ, আর সমস্ত চেতনা জুড়ে নেমে আসছে অদ্ভুত এক নিঃশব্দ বৃষ্টি। বুক ভরে ওঠে। ভরে ওঠে ভালবাসায়। ছোঁয়া যায় না। এখন আর শরীর ছোঁয়া যায় না। কাটা দেয়।

মেয়েটির চোখে হঠাৎ চোখ পড়ে যায় শ্যামের, ভ্রূ কুঁচকে মেয়েটি তাকে এক পলক দেখে, তারপর অস্বস্তিতে চোখ সরিয়ে নেয়। সামান্য এক-আধ পা সরে যায়, একটু ঘুরে দাঁড়ায়। শ্যাম আবার ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায় ফুটপাথের ধার ঘেঁষে, আবার মেয়েটির মুখোমুখি হয়। মেয়েটির চোখ আবার তার চোখের ওপর ঘুরে যায়। সামান্য নড়ে ওঠে মেয়েটি, শীতে কিংবা ভয়ে সামান্য কেঁপে ওঠে। মুখ ফিরিয়ে নেয়। অসহায়ের মতো হঠাৎ চারদিকে চেয়ে দেখে। বিরক্তিতে কামড়ে ধরে ঠোঁট, মাটিতে পা ঘষে নেয় রাগে।

হঠাৎ শ্যামের খেয়াল হয় যে, তার চারপাশে কথাবার্তার শব্দ থেমে গেছে। অনেকেই লক্ষ করছে তাকে। কথা থামিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে অনেক লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ সরিয়ে দেখে নিচ্ছে মেয়েটিকে। তাদের চোখে-মুখে কৌতুক। ভীষণ চমকে ওঠে শ্যাম, তার হাত-পা কেঁপে ওঠে। সে নিজের দিকে চেয়ে দেখে–কী করেছে সে। এতক্ষণ সে কী করেছে।

চকিতে শ্যাম মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার নাকে মুখে ছুটে আসে রক্তের গরম ঝাপটা। অপমানে কেঁপে ওঠে তার শরীর। দ্রুত সে ফুটপাথ ছেড়ে বৃষ্টির রাস্তায় নেমে পড়ে। হেঁটে যেতে থাকে।

তারপর কেবল হরিণ আর হরিণ। চারদিকে অজস্র অসংখ্য ধাবমান অদৃশ্য হরিণের পায়ের শব্দ। যতদূর চোখ যায়, বাষ্পকার জলকণায় আঘো-অন্ধকারে রাস্তাঘাট, ময়দান আদিগন্ত রহস্যময় হয়ে গেছে। নিশ্চিন্ত মনে নিরুপদ্রবে হেঁটে যায় শ্যাম। তার মাথা গাল দাড়ি বেয়ে নেমে আসে কেঁচোর মতো হিম জলের কয়েকটা রেখা। শীতে তার শরীর কাঁপে। তবু সে টের পায় তার ভিতরে উষ্ণ রক্তস্রোত, বুকের মধ্যে উথাল-পাথাল, মাথার মধ্যে যন্ত্রণার মতো একটি প্রশ্ন, তুমি কে? তুমি কে?

হঠাৎ মনে পড়ে যায় শ্যামের। দুটি সাদা সুন্দর হাত টেলিফোন থেকে নোটবইয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মদরঙের কাঠের পালিশে ছায়া ফেলে। লীলা!

‘ইয়াঃ’ বলে হেসে ওঠে শ্যাম। লীলাই। হায় ঈশ্বর! তোমার জন্যই আমি বৃষ্টির মধ্যে ভোলা রাস্তায় নেমে এলুম! গায়ে তুলে নিলুম-শীত!

হঠাৎ দুটি হাত ওপরে তুলে পাগলের মতো আপনমনে আবার হাসে শ্যাম, ঠিক আছে, তোমার জিত।

অনেক দিন পর নিজেকে একটু জীবন্ত বলে মনে হয় শ্যামের। সে শুনতে পায় তার শরীরের মধ্যে কারখানা চলার মতো শব্দ করে চলেছে কলকবজা। সে বড় বেঁচে আছে।

রাতে বিছানায় শুয়ে আধো ঘুমের ভিতরে সে তার বালিশের কাছে একটা নাম বলে রাখল। বালিশে নাক ঘষল। হাসল। লীলা! আঃ-হাঃ!

১০. নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা

নিজেকে লুকিয়ে রাখার কোনও চেষ্টাই করল না শ্যাম। খোলা রাস্তায় রোদের মধ্যে সে দাঁড়াল থামে ঠেস দিয়ে। অদুরে কাচের শার্সি লাগানো দরজাটা। চোখ থেকে রোদ-চশমা খুলে নিল শ্যাম। প্রথমে ভাল দেখা গেল না, বেলা তিনটের খর রোদ চোখ ধাঁধিয়ে দিল। হাত দিয়ে চোখ আড়াল করল সে। তারপর ছায়ামূর্তির মতো আবছা লীলাকে দেখা গেল মদরঙের কাউন্টারের ওপাশে। প্রথমে চেনা গেল না লীলাকে। তার মুখ-চোখ ঝাপসা দেখা যাচ্ছিল, লীলার পিছনের দেয়ালে একটা ফ্লুরেসেন্ট আলো জ্বলছে। তারপর ক্রমে ক্রমে দেখা গেল সেই দুটি সুরে বাঁধা হাত, স্বয়ংক্রিয়, কাজ করে যাচ্ছে। কপাল থেকে চুর্ণ চুল সরিয়ে দিচ্ছে লীলা, ডান হাতে তুলে নিচ্ছে পেনসিল, বাঁ হাতে টেলিফোন, রিসিভার কানে চেপে কাত হয়ে শুনছে কিংবা একটু ক্লান্ত দীর্ঘ মিষ্টি স্বরে বলছে ‘হেঃ...ল্লো...’ দুটি চোখে সামান্য ঘুম-পাওয়া ভাব। - তুলে কথা বলছে তার নানা অতিথির সঙ্গে, হেসে ঠাট্টার উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। তবু কিছুতেই তাকে এই পৃথিবীতে ব্যবহৃত মেয়ে বলে মনে হয় না শ্যামের, মনে হয় না যে, সে খাওয়া-পরার জন্য, উন্নতির জন্য, সঞ্চয়ের জন্য কাজ করছে। মনে হয় না একটি নাম কিংবা পরিচয়ে বাঁধা আছে সে।

শ্যাম সরল একটা গাছের মতো সামান্য একটু পিছনে হেলে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। মুখে মৃদু হাসি। তার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ছায়ার মতো অলীক লোজন—যাদের কোনও অস্তিত্ব নেই, যেন ব্র্যাকেটে। ঝোলানো জামাকাপড়। চারদিকের কোনও শব্দও পায় না শ্যাম—যেন সে এক নিঝুম ঠান্ডা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের কাচের দরজাটা ঠেলে লোকজন আসছে যাচ্ছে, কিন্তু কারও মুখই ভাল করে দেখে না শ্যাম। দুটি ভিখিরি ঘ্যান ঘ্যান করল শ্যামের সামনে, তারা মেয়ে না পুরুষ তাও দেখল না শ্যাম, পকেট থেকে পয়সা তুলে দিয়ে দিল, কী দিল বা কত তা খেয়াল করল না। একবারও ঘড়ি দেখল না শ্যাম, কটা বাজে—এ-প্রশ্ন তার কাছে অপার্থিব মনে হল। সে শুধু টের পাচ্ছিল

যে, শুধু দু পায়ের জোরে সে এখানে দাঁড়িয়ে নেই, আর তার ভিতরে জন্ম নেওয়ার আগে শিশুর মতো কোনও বোধ কেঁপে উঠছে। এভির চাদরের তলায় তার সমস্ত শরীর শক্ত, লোহার মতো কঠিন হয়ে আছে সমস্ত পেশি, মাঝে মাঝে তার চোয়ালের হাড় টিবির মতো ফুলে উঠছে। আর ক্রমান্বয়ে বুকের ভিতরে নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে অদৃশ্য বৃষ্টিপাত, আর হরিণ দৌড়ে যাওয়ার শব্দ। সে টের পায় সে বড় বেঁচে আছে।

লীলা কাজ করে যাচ্ছে। কেবলই কাজ করে যাচ্ছে। নড়ে যাচ্ছে তার দুটি কাজের হাত, তার ঠোঁট কেবলই কথা বলে যাচ্ছে। কোনও কথাই বুঝতে পারেনা শ্যাম, তবু যেন বুঝতে পারে। হ্যাঁ, আমি জানি তুমি কী বলছ। তুমি দূর-দূরান্তের লোককে বলতে চাইছ—দেখো, আমি কত বেঁচে আছি। দেখো, আমার এখনও বয়স হয়নি। আমার কাছে এখনও বড় রহস্যময় এই জীবন। আমি ভালবাসতে শিখেছি...!

মাঝে মাঝে তার সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক চোখ রাস্তার ওপর দিয়ে ঘুরে যাচ্ছিল। হয়তো সে এক পলক দেখে নিল একটা লোকের কালো কোট, একটা গাছের একটু পাতা, দুই-একটি কাক, একটা দেয়ালে সাঁটা মিছিলের আহ্বান।

শ্যাম অপেক্ষা করে রইল। এই ভিড়ের রাস্তায়, এত কিছুর মধ্যে তুমি আমার দিকে একবারও লক্ষ করবে কি!

শ্যাম টের পাচ্ছিল, আস্তে আস্তে আলো মরে আসছে। অন্ধকার হয়ে গেলে লীলা আর তাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তখন উজ্জ্বল ঘরের মধ্যে লীলাকে আরও স্পষ্ট দেখা যাবে। শ্যাম মুখে মৃদু হাসি আর ঋজু শক্ত শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়েই রইল। হয়তো কিছুই ঘটবে না। হয়তো বিস্ফোরণের মতো কিছু ঘটবে। শ্যাম জানে না।

লীলার মুখ আড়াল করে একটি লোক কাউন্টারে ঝুঁকে দাঁড়াল একটুক্ষণ। সরে গেল। লম্বা একটা লোক শ্যামের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছিল, কয়েক পলক আবার আড়ালে পড়ল লীলার মুখ। বিরক্তিতে আট ফুট লম্বা হয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল

শ্যামের। সেই ইচ্ছে টের পেয়েই বোধহয় লোকটা তাড়াতাড়ি হেঁটে গেল। সামান্য চমকে উঠল শ্যামমিনু না? পরমুহূর্তেই লোকটাকে ভুলে গিয়ে লীলার ওপর চোখ রাখল। লীলার চারদিকে ক্রমে আলোর উজ্জ্বলতা বাড়ছে, নিঃশব্দে শ্যামের চারদিকে নেমে আসছে অন্ধকার।

আর-একটু হলেই অন্ধকার সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিত শ্যামকে। এ সময়ে লীলা নোট টুকে রাখতে গিয়ে বাধা পেয়ে বাঁ হাতে টেলিফোন নিয়ে মুখ তুলতেই তার চোখ শ্যামের ওপর আটকে গেল। পলকে পাথর হয়ে গেল লীলা, মুখ সামান্য ফাঁক করে সে চেয়ে রইল, চিৎকার করে ওঠার আগের মতো ভয়ে তার ডান হাত উঠে এল মুখের কাছে, যেন সে এক্ষুনি লোক জড়ো করে ফেলবে। কয়েকটি ভয়ংকর মুহূর্ত ধরে সে শ্যামের ছায়ার মতো মূর্তির দিকে চেয়ে রইল। তারপর শ্লথ হয়ে নেমে গেল তার হাত, কাউন্টারের ওপর সেই হলুদ পেনসিল চেপে ধরল প্রাণপণে, চোখ বুজে সে দাঁতে দাঁত চেপে টেলিফোনে কথা বলে গেল।

একটুও নড়ল না শ্যাম। সে মৃদু হাসল। শরীরের ভিতরে চালু কারখানার শব্দ। সে বড় বেঁচে আছে। বুকে হাত রাখে শ্যাম। একটি রহস্যময় রেলগাড়ি বহু দূরের এক অচেনা পুল পেরিয়ে যাচ্ছে।

লীলার হাতে আর সাবলীলতা ছিল না। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সে টেলিফোন রেখে দিল, ঝুঁকে পড়ল কাউন্টারের ওপর। জোর করে নামিয়ে রাখা মুখ, ঘাড়ের তেজি বাঁকের ওপর অহংকার আর অবহেলা ফুটে আছে। শ্যাম লক্ষ করল। তার দুঃখ হচ্ছিল যে, সে আজও নিজেকে সাজায়নি। সাজলে আজ লীলা তাকে চিনতই না। গালে রুক্ষ দাড়ি, গায়ে এন্ডির চাদর, ধুতি আর স্যান্ডেল পরা এই চেহারা তার। নিয়তির মতো, লীলার কাছে তাকে এভাবেই আসতে হবে, শ্যাম জানো নইলে লীলা তাকে আর পাঁচটা লোকের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলবে, পেনসিল চেপে ধরবে না প্রাণপণে, চোখ বুজে ফেলবে না, নামিয়ে নেবে না মুখ, শ্যাম জানে।

আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে গেল লীলার ভঙ্গি। কিন্তু তার অলস ভাব রইল না, সে আর হাসল না এবং আর একবারও তাকাল না শ্যামের দিকে। সে শুধু মাঝে মাঝে আড়চোখে দরজাটা দেখে নিচ্ছিল বোধহয় এই ভয়ে যে, শ্যাম যে-কোনও সময়ে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়তে পারে।

শ্যাম মৃদু হাসে। দাঁড়িয়েই থাকে। মাঝে মাঝে শুধু শরীরের ভর এ পা থেকে ও পায়ে সরিয়ে নেয়।

অন্ধকার হয়ে এল। শ্যামের মাথার উপর টুক করে জ্বলে উঠল রাস্তার আলো। শ্যামের সামনে দাঁড়িয়ে একটা বেঁটে লোক, সে একটা দামি চোরাই কলম, কিনবে কি না তা বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল। শ্যাম মাথা নাড়ল। না। বস্তুত কলম শব্দটাই সে ধরতে পারল না।

ক্রমশ সে বুঝতে পারছিল তার চার ধারে লোকজনের ভিড় বেড়ে যাচ্ছে, অফিস- ছুটির ভিড়। এবার অনেকেই তাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হবে। কে জানে এদের মধ্যে সেদিন বৃষ্টির বিকেলের দু-একজন লোক আছে কি না, যারা তাকে আর লীলাকে চিনতে পারবে। মৃদু হাসল শ্যাম। তবু দাঁড়িয়েই রইল।

সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, আস্তে আস্তে হাতের কাজ শেষ করে ফেলল লীলা। গুছিয়ে রাখল তার কাগজ। তারপর চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। দ্বিধা। এবার সে বেরিয়ে আসবে। সে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ ঝলমল করে উঠল তার হলুদ শাড়ি, শাড়ির সবুজ পাড়, সবুজ ব্লাউজ, উঁচু চেয়ার থেকে নামতেই তাকে ছোটখাটো দেখাচ্ছিল। সে ক্লান্ত ভঙ্গিতে কপালের চুল সরিয়ে কাউন্টারের ভিতর থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

কিছুক্ষণ পরে কাচের দরজা ঠেলে ছায়ামূর্তির মতো বেরিয়ে এল রাস্তায়। শ্যাম দেখল তার সঙ্গে খাকি পোশাক পরা পিয়ন গাছের একজন লোক রয়েছে। সতর্কতা। লোকটা

লীলার পাশাপাশি হেঁটে গেল। পিছু নিল শ্যাম। একটু দূরে থেকে দেখল বড় দ্রুত হাঁটছে তারা। লোকটাই একটা ট্যাক্সির সামনে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সিটাকে দাড় করাল। একবারও ফিরে তাকাল না লীলা। চকিতে ট্যাক্সির ভিতরের অন্ধকারে ঢুকে গেল। এত দ্রুত ঘটল এসব ঘটনা যে, শ্যাম তার ঘোর কাটিয়ে উঠতে না-পেরে বোকার মতো দাঁড়িয়ে দেখল। দাঁড়িয়েই রইল। মুখে সেই মৃদু হাসি, সমস্ত শরীরে শক্ত ঋজুভাব।

.

রাতে খাওয়ার সময় আবার মুখোমুখি মিত্রর সঙ্গে দেখা। বলল, অটোমেশন এসে যাচ্ছে মশাই। আমাদের অপশন দিচ্ছে, সময়ের আগেই অবসর নিয়ে নিন, কোম্পানি কমপেনসেশন দেবে মোটা টাকার। তা ভাবছি এবার বসেই পড়ি মশাই, এত খাটাখাটনি যে কার জন্য তা বুঝতেই পারি না।

শ্যাম অন্যমনস্কভাবে হাসে।

পনেরো বছরের ওপর চাকরি হয়ে গেল বয়সের কথাটা বোধহয় খেয়াল ছিল না মিত্রর, তাই বলেই চকিতে একটু হাসল, সার্টিফিকেটে যা-ই থাক মশাই, আমার প্রায় চল্লিশ এখন, কিন্তু এখনই কেমন বুড়ো বুড়ো লাগে নিজেকে। অফিসে যতক্ষণ কাজকর্মে থাকি ততক্ষণ মনে হয় বাইরে বোধহয় খুব আলো বাতাস, হইহল্লা আনন্দের মচ্ছব চলছে, আবার বাইরে এসে সময় কাটতে চায় না। আগে ফুটবল খেলা দেখার ঝোঁক ছিল, একটু-আধটু তাস-দাবা খেলতুম, এখন আর তাও পরিশ্রম বলে মনে হয়। বইপত্রও ঘাঁটি না কতদিন! মাঝে মাঝে শুধু জ্যোতিষের বই খুলে নিজের হাত দেখি আর হাসি। বলতে বলতেই একটু ঝুঁকে পড়ল মিত্র, সামান্য চাপা গলায় বলল, বিশ্বাস করুন মশাই, আমার হাতে অনেক ভাল সাইন ছিল, সুন্দর সান লাইন আর বৃহস্পতির মাউন্ট বলতে বলতে মিত্র তার এঁটো ডান হাতটাই প্লেটের কানায় একটু চেঁছে নিয়ে খুলে দেখাল-দেখুন না!

শ্যাম দেখল মিত্রর এবড়োখেবড়ো হাত, ভোঁতা নখ আর মাছের ঝোল লাগা কালচে একটা হাতের চেটো। বলল, বাঃ!

মিত্র হাসে, হাতের জন্যই কনফিডেন্স ছিল আমার, ভেবেছিলুম এর জোরে বেরিয়ে যাব। তা ছাড়া দেখুন, কুমপৃষ্ঠের মতো আমার লাইন অব হেড। শুক্রস্থান ভাল। হাতে প্রেমের চিহ্ন আছে-লাভ ম্যারেজ। কিন্তু ঠোঁট উলটে হাসল মিত্র, কিছুতেই কিছু হয় না মশাই! চল্লিশে আমি রিটায়ারমেন্টের কথা ভাবছি! ছুটি নিয়ে গ্রামে-টামে চলে যাব, খুলব একটা পোলট্রি, ডিম মুরগি বেচব। কী বলেন?

শ্যাম হাসে।

মিত্র মাথা নাড়ে, কিংবা রমতা যোগীও হয়ে যেতে পাবি। ঠিক নেই। কোরবদ্রী কাশীধাম ঘুরে ঘুরে বেড়াব। বড় ইচ্ছে ছিল মশাই, ঘুরে বেড়াবার, কিন্তু কেমন যেন মন হয়নি, হাওড়া ব্রিজ পেরোবার কথা হলেই আলিস্যি ধরে, কতকাল যে রেলগাড়িতে চড়িনি!

বাইরে এসেও শ্যামের সঙ্গ ছাড়ল না মিত্র। বলল, চলুন, অনেককাল পর আজ মনটা হালকা আছে, একটু ঘুরে বেড়াই রাস্তায়। খাওয়ার পর হাঁটা ভাল।

হাঁটতে হাঁটতে মিত্র কথা বলে, জীবনটাকে দেখতে হলে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে হয় মশাই। ঘরে থাকলেই কেবল ভার-ভার ভয়-ভয় লাগে, কেবলই ট্রাঙ্ক বাক্সে হাত বুলোই, জানালা দরজা নেড়ে দেখি, অকাজের চিন্তায় বুকে গর্ত খুঁড়ে ফেলি। অথচ আমার ভাবনার কিছু নেইঝাড়া হাত-পা, ভাই চাকরিতে, বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, বুড়ো বাপ-মা নেই, কিন্তু ওই একটুখানি একখানা ঘরই আমাকে মেরে রেখেছে মশাই, ওইটুকুরই বড় মায়া! বড় করে শ্বাস ছাড়ে মিত্র, ভাল করে চাদর জড়ায় গায়ে। বলে, ইচ্ছে ছিল ঘরটাকে অমন অনাবাদী ফেলে রাখব না...হাঃ হাঃ...ফুলে-ফুলে ভরে তুলব।

গোল পার্ক থেকে গড়িয়াহাটার দিকে ফিরে আসে দুজন। পাশাপাশি হাঁটে। মিত্রই কথা বলে যায়, অটোমেশন এসে গেল, যন্ত্রপাতির হাতে কাজ কর্ম বুঝিয়ে দিয়ে এবার আয়েসি মানুষদের ছুটি। এতদিনে বুঝি মশাই, কাজকর্ম আসলে যন্ত্রপাতিরই, মানুষের নয়।

শ্যাম হাসে। অন্যমনে হাঁটে।

বিধবাতেও আমার আপত্তি ছিল না মশাই, আমি শুধু শান্তশিষ্ট একজনকে চেয়েছিলুম, বয়স জাত রূপ কোনওটাই আমার দেখার ছিল না। কিন্তু কেবল মুখ ফুটে কাউকেই বলতে পারলুম না। বড় লজ্জা করে। একটু বেশি বয়সেই বিয়ের কথা ভেবেছিলুম, বয়স থাকার সময়ে ভাবতুম কেবল তার কথা, যে আমাকে দিব্যি দিয়ে নিজে সরে পড়েছে।...আয়ুটা বড় লম্বা, কী বলেন?...তা ঠিক বয়সে যখন বিয়ে করিনি, এই বয়সে আর লোককে নিজের বিয়ের কথা কী করে বলা যায়!...বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত কোথায় যেন আটকে যায়। বলতে পারি না। লজ্জা করে।

গড়িয়াহাটার কাছে মিত্রকে ছেড়ে দিল শ্যাম। মিত্রকে একই সঙ্গে খুশি আর বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েও পিছু হটে এল মিত্র, বলল, আমাকে খুব অসহায় মনে করবেন না মশাই, আমি নিরস্ত্র নই। অনেক দিন থেকে নিজেকে সশস্ত্র রেখেছি আমি...হাঃ হাঃ...সময় থাকতেই জোগাড় করে রেখেছি পরিমাণ মতো ঘুমের ওষুধ...সতেরোটা ট্যাবলেট আছে আমার, হ মশাই, সতেরোটা। মায়ের ছিল না-ঘুমোনোর অসুখ, তখন থেকে চুরি করে জমিয়ে রাখা...জানতুম একদিন না একদিন কাজে লাগতে পারে...মাঝে মাঝে শিশিটা বের করে নেড়েচেড়ে দেখি...হাতে নিলেই মশাই, কেমন একটু জোর পাই, মনে বল-ভরসা এসে যায়, আর ভয় লাগে না...হাঃ হাঃ...

তারপর গলা নামিয়ে বলল, দরকার হলে বলবেন। যা ট্যাবলেট আছে তাতে দু'জনের ঢের হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে আরও এক-আধজনকে বলে দেখবেন। অনেকেই রাজি হবে। আমি ফ্রি দেব...হাঃ হাঃ...

শ্যাম মৃদু হেসে বলল, নেব। আমার দরকার হবে।

আচ্ছা, বলে গম্ভীর মুখে মিত্র চলে গেল।

দূর থেকে শ্যাম দেখল খয়েরি তুস চাদর গায়ে মাতাল একটা ভল্লুকের মতো মিত্র আলো-ছায়ায় হেঁটে যাচ্ছে তার জমিয়ে রাখা সতেরোটা ঘুমের বড়ির দিকে। তাকে পিছু ডাকতে ইচ্ছে হয় না। তাকে শ্যাম চলে যেতে দিল।

১১. ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল শ্যাম

ঠিক দুপুরবেলায় ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল শ্যাম। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট খুলে দেখল-শেষ সিগারেট। সেটা ধরিয়ে নিয়ে প্যাকেটটা শূন্যে ছুড়ে দিয়ে বাঁ পায়ে নিখুঁত একটা শট করল সে। প্যাকেটটা রেলিং টপকে গিয়ে দেয়ালে লেগে পড়ল সিঁড়ির বাঁক ঘুরবার চাতালে, শ্যাম আপনমনে হাসল–গো-ও-ও-ল! রেলিঙে ঝুঁকে ভারসাম্য রাখল, তারপর মসৃণ রেলিঙে হাত ছুঁইয়ে তর তর করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেল। পায়ে করে আবার সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নেয় সে। তারপর পায়ে পায়ে সেটাকে নিয়ে খেলতে খেলতে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে–ইন আউট..ইন আউট..ইন আউট–আপনমনে বলে সে। অনেক স্মৃতি অনেক কথা ও দৃশ্য, ভাঙা শব্দ বুকের ভিতরে, মাথার ভিতরে ঝিলমিল করে ওঠে তার। কচ্ছপের পিঠের মতো এক ঢাল সবুজ মাঠ, একটা সাদা বল, আর সে ছুটছে আর ছুটছে...সামান্য হাসে সে, খাস টানে, তারপর আবার নামতে থাকে।

বড় রাস্তায় এসে এসপ্ল্যানেডের বাস ধরল শ্যাম।

নির্দিষ্ট জায়গায় ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়াল শ্যাম। চোখের রোদ-চশমা খুলে নিল। মৃদু হাসল।

আবছা দেখা যেতে লাগল লীলার অবয়ব। তারপর জলের গভীর থেকে যেভাবে আস্তে আস্তে মাছ উঠে আসে জলের ওপরে, তেমনি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল সেই দুখানি সাদা ব্যস্ত হাত, গোল সুন্দর মুখখানা, কপাল-ঢাকা চুল। আজ তার সাদা ব্লাউজ। মাথায় উঁচু করে বাঁধা মস্ত খোঁপা।

দাঁড়াতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। চমকে উঠল না লীলা, মুখ ফাঁক হয়ে গেল না। বরং জুড়ে গেল ঠোঁটে ঠোঁট, ভ্রূ কুঁচকে উঠল, দৃঢ় হয়ে গেল চোয়ালের হাড়। এক পলক দেখা হতেই সে তার চোখ সরিয়ে নিল। ব্যস্ত হয়ে গেল কাজে।

শ্যাম জানত এরকমই হবে। এরকমই হয়। মৃদু হেসে সে দাঁড়িয়ে রইল। ক্রমে অলীক এক আবছায়ার মধ্যে চলে যেতে লাগল তার চারপাশ, পথ-চলতি লোকজন, লুপ্ত হয়ে গেল সময়ের বোধ। আর কেবলই রেলগাড়ির শব্দ, হরিণের খুরের আওয়াজ, নিঃশব্দ এক বৃষ্টিপাতে ভরে আসে তার বুক, শরীরের ভিতরে ধীর গম্ভীর মেঘ ডেকে ওঠে।

চোয়াড়ে চেহারার একটা নোক লীলার সঙ্গে কথা বলছে। লোকটার পরনে গাঢ় গরম প্যান্ট, গায়ে সাদা সোয়েটার। লোকটা খুব ভদ্রভাবে হাসছে, কিন্তু তার মতলব শ্যাম পরিষ্কার বুঝতে পারে। সে নানা কথায় ভোলাচ্ছে লীলাকে। ওই তো লীলার মুখ-চোখ কোমল হয়ে এল, স্বপ্ন দেখার মতো অলস হয়ে এল চোখ, দু'টি ব্যস্ত হাত কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে আছে কাউন্টারের ওপর। লীলার ঠোঁটে চাপা আনন্দের হাসি! বোধহয় ঘরে আর কেউ নেই, কিছুক্ষণের অবসর পেয়ে গেছে লীলা। টেলিফোনটাও বোধহয় বাজছে না, কিংবা বাজলেও উত্তর দিচ্ছে না লীলা।

লোকটাকে শ্যামের চেনা মনে হয়। অনেকক্ষণ সে দেখে। সেই লোকটা কি, শ্যাম যার পিছু নিয়েছিল। লোকটা, ওই বদমাশ লোকটা এখানে কেন তা বুঝল না শ্যাম, সে শুধু মনে মনে আর্তনাদ করে উঠলকথা বোলো না। ওর সঙ্গে কথা বোলো না। কী কথা ওর সাথে? মুখ ফিরিয়ে নাও, কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ো। অনেকক্ষণ ধরে তোমার টেলিফোন বেজে যাচ্ছে, উত্তর দাও। বাইরে সন্ধে হয়ে এল, তুমি কাজ সেরে নাও। ওর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা, আপনি এখন আসুন...! কিংবা আরও কোনও কর্কশ কথা বলো লীলা, ওকে বের করে দাও। কিংবা আমাকে চোখের ইশারায় ডাকো, আমি ভিতরে গিয়ে ওকে বের করে আনছি। আমি ওকে চিনি, ও ভিড়ের মধ্যে লোকের পকেট হাতড়ে দেখে, মেয়েদের বুক ছুঁয়ে আসে ওর লোভী হাত। কথা বোলো না আর। লীলা, চুপ করো। কী কথা ওর সাথে! তুমি কি জানো না যে, একজন তোমাকে দেখছে?

বোধহয় টেলিফোন বাজল। লীলা একটু হেলে কানে চেপে ধরল টেলিফোন, ডান হাতে সে হলুদ পেনসিলটা ঠুকতে লাগল ডেস্কের ওপর, তবু লোকটার দিকে চেয়ে আছে সে, মৃদু হাছে। লোকটা সোয়েটারটা দু হাত দিয়ে একটু টেনে নামায়, ডেস্কের ওপর সামান্য ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়ায় টেলিফোনটার দিকে। লীলা মাথা নাড়ে, পিছনে একটু হেলে সরে যায়। হাসে।

ওরা খেলছে–শ্যাম টের পায়। সমস্ত শরীর রি-রি করে ওঠে শ্যামের। আত্মবিস্মৃতি ঘটে যেতে থাকে। কী সাহস ওই লোটার! কেবল কাছে দাঁড়িয়ে থেকে, কেবল কথা বলে বা কেবল চোখের দৃষ্টিতে ও নষ্ট করে দিচ্ছে লীলার পবিত্রতা।

আর লীলা জানে যে শ্যাম তাকে দেখছে। তবু তার হৃক্ষেপ নেই। কিংবা কে জানে, লীলা তার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে কি না!

এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যায় শ্যাম। কী করছে তা বুঝতে পারে না। দরজার খুব কাছে এসে সে দাঁড়ায়। কাচের পাল্লায় তার লম্বা, শীর্ণ, এলোমেলো পোশাক পরা চেহারাব ছায়া ভেসে ওঠে। তার নিশ্বাসের ভাপ লেগে আবছা হয়ে যায় খানিকটা কাচ। তীব্র চোখে সে ভিতরের দিকে চেয়ে থাকে।

টেলিফোন রেখে সোজা হয়ে বসেই হঠাৎ শিউরে ওঠে লীলা, চিৎকার করে উঠতে গিয়েও মুখে হাত চাপা দেয়, অসহায় দুটি চোখ বিশাল হয়ে যায়। চোয়াড়ে চেহারার লোকটা বিদ্যুদবেগে চিতাবাঘের মতো ঘুরে দাঁড়ায়। শ্যাম দেখে, তার দুটো হাত মুঠো পাকানো, কিন্তু হতভম্বের মতো শ্যামের দিকে চেয়ে আছে।

শ্যাম মৃদু হাসে। তারপর এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে আসে আবার। ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় নিশ্চিন্ত মনে। শান্তচোখে চেয়ে থাকে হতভম্ব বিব্রত লোকটার দিকে চোখ দিয়েই বুঝিয়ে দেয়–সাবধান! আমি পাহারায় আছি।

লোকটা একটুক্ষণ তাকে দেখে, তারপর অস্বস্তিতে চোখ ফিরিয়ে নেয়। লীলা মুখ নিচু করে বসে আছে। দু'জন সুট পরা সাহেব ভিতরে ঢুকে গেল। তারা লীলার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলল। শ্যাম লক্ষ করে যে লীলার মুখ অল্প লাল, সে অনায়াসে হাসছে না আর, মাথা নেড়ে থমথমে মুখে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল। ঘর খালি হয়ে গেল আবার। চোয়াড়ে চেহারার লোকটা লীলার দিকে ফিরে কী যেন জিজ্ঞেস করল। লীলা মাথা নাড়লনা। চোখ নিচু করে রইল। লোকটার মুখে সামান্য হতাশা ফুটে উঠছে। শ্যাম দেখে। লোকটা একটু ইতস্তত করে, তারপর কাউন্টারের ওপরে রাখা ফোলিও ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে আসে। দরজার বাইরে এসে লোকটা থমকে শ্যামের দিকে এক পলক তাকায়। শ্যাম গ্রাহ্য করে না। লোকটা বাঁ দিকে হেঁটে চলে গেল।

নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে থাকে শ্যাম। নড়ে না।

আস্তে আস্তে তার চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে। ঘরের মধ্যে লীলাকে উজ্জ্বল দেখায়। বাচ্চা মেয়ের মতো অভিমানী গম্ভীর তার মুখ। শ্যাম হাসে। তার ঠোঁট নড়ে ওঠে– তোমাকে ওখানে মানায় না। এত ভিড়ের মধ্যে আর এত লোকজনের চোখের সামনে তোমাকে মানায় না। ভেবো না, আমি তোমার জন্যেই একদিন পৃথিবীকে খুব নির্জন করে দেব, চুপ করিয়ে দেব সবাইকে। গভীর শরবনের জঙ্গলে। ডুবিয়ে দিয়ে যাব সমস্ত শহর। ...কে ওই লোক যার সঙ্গে তুমি কথা বলছিলে? ওরকম হৃদয়হীন চেহারার লোক পৃথিবী থেকে যত কমে যায় তত ভাল। তুমি কখনও ওই লোকের সঙ্গে দূরে যেয়ো না।

কাজ শেষ হয়ে গেলে লীলা সতর্কভাবে একবার দরজার দিকে চেয়ে দেখল। তারপর একটা টেলিফোন করল। পিছনে হেলান দিয়ে বসে রইল চুপচাপ। ঘরের মধ্যে দিয়ে যাওয়া-আসা করল অনেক লোক, শ্যাম তাদের লক্ষ করল না। লীলার বসে থাকার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল যে, সে কারও অপেক্ষায় আছে। মৃদু হাসল শ্যাম, কেননা সে জানে যে, তাতে লীলার কোনও লাভ নেই।

কিন্তু অনেকক্ষণ কেউ এল না। লীলা উঠে ভিতরে গেল, আবার ঘুরে এল, কাউন্টারের উপর ঝুঁকে দরজার দিকে পিঠ করে কিছু একটা দেখার ভান করে অপেক্ষা করল। আবার অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে একটু হেঁটে বেড়াল। তারপর ধীরে ধীরে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল লীলা। পিছনে আলো, তাই লীলাকে ছায়ার মতো দেখায়। কাচের খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল লীলা। শ্যাম স্পষ্ট বুঝতে পারে, ওই অন্ধকার মুখ থেকে দুটি অদৃশ্য চোখ তাকে লক্ষ করছে, বলছে, কী চাও রাস্তার লোক? কী চাও অচেনা?

সে দুটি প্রশ্নই শুনতে পায় যেন। অমনি কেঁপে ওঠে তার শরীর, ভুল পেয়ে বসে তাকে। সে বিড় বিড় করে বলে, আমি জানি না আমি কী চাই। আমি জানি না।

অস্থিরভাবে চোখ সরিয়ে নেয় শ্যাম। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে সে শুনতে পায় দূরের রাস্তায় বাঁক নিয়ে ছুটে আসছে একটা মোটরসাইকেল, তারপর তার গতি ক. সে, ধীরে ধীরে মোটর-সাইকেলটা তার ঠিক পিছনে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়ায়। নিথর হয়ে যায় শ্যাম। অবশ চোখে চেয়ে দেখে, তার পাশ দিয়ে চটপট পায়ে একটি ছেলে চলে গেল কাচের দরজাটার দিকে। চাপা কালো প্যান্ট আর সাদা পুল-ওভার পরা, ছোট করে ছাটা মাথার চুল, একটু বেঁটে কিন্তু মজবুত চেহারার ছেলেটি দরজার দিকে হাত বাড়াতেই যেন মন্ত্রবলে দরজা খুলে গেল। সেই প্রথম দিন শোনা একটু তীক্ষ্ণ কিন্তু মিষ্টি গলাটি শুনতে পেল শ্যাম, এত দেরি! কখন টেলিফোন করে বসে আছি...

ছেলেটি হাসে, এই বিশ্রী ট্রাফিকে আসা যায়? ঘুরে আসতে হল, তাও ক্লিয়ার রাস্তা পেলুম না...কী ব্যাপার?

কই! কিছু না।

কিছু না?

না।

দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে এল শ্যামের দিকেই। নড়ল না শ্যাম। লীলা ছেলেটির বাঁ পাশে ছিল, যে-পাশে শ্যাম। কয়েক পা হাঁটার মধ্যেই লীলা কৌশলে ছেলেটির ডান পাশে সরে গেল। তারপর তাকে পেরিয়ে গেল তারা। শ্যাম ঘাড় ঘোরাল না। শুনতে পেল স্টার্টারে লাথি মারার শব্দ, তারপর গুর গুর করে ডেকে উঠল মোটরসাইকেল। দূরের দিকে ছুটে গেল। সরল একটি গাছের মতো সে দাঁড়িয়ে রইল। বাতাসে পেট্রলের গন্ধের সঙ্গে আর-একটি মিষ্টি মৃদু গন্ধ, বোধহয় পাউডারের। আগে অনেক পাউডারের গন্ধ চেনা ছিল শ্যামের। এখন ভুলে গেছে, মৃদু হেসে সে মাথা নাড়লনা, সে এ-গন্ধটা চেনে না।

তোমার কি অনেক প্রেমিক? ভাল, কিন্তু দেখো, একদিন পৃথিবী খুব নির্জন হয়ে যাবে। তখন তোমার লুকিয়ে থাকার নিরাপদ জায়গা থাকবে না, থাকবে না পালিয়ে যাওয়ার সহজ পথ।

ভিড়ের ভিতরে পথ করে ধীরে হাঁটছিল শ্যাম। হাঁটতে হাঁটতে বলছিল, আমি জানি না কী করে ভয় দেখাতে হয় চোয়াড়ে চেহারার বিশ্রী স্বভাবের লোকদের, আমি জানি কীভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হয় মোটর-সাইক্লিস্টদের। তুমি কেন দেখিয়ে দাওনি আমাকে! কেন ছেলেটিকে বলোনি যে, এই লোকটার জন্যই আমি রাস্তায় একা বেরোতে পারছিলুম না। কিংবা তুমি সেই চোয়াড়ে চেহারার লোকটাকেও বলতে পারতে-আমাকে বাঁচাও।

হাঁটতে হাঁটতে অভিভূতের মতো হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে শ্যাম। কেন? পিছন থেকে চলন্ত একটা লোক তার গায়ে ধাক্কা খায়। শ্যাম টাল খেয়ে হেসে ওঠে-কেন ধরিয়ে দাওনি আমাকে? তারপর আবার হেঁটে যায়।

বস্তুত পৃথিবী খুব নির্জন হয়েই গেছে। খুব জীবন্ত মানুষজন শ্যামের চোখে পড়ে না। ব্র্যাকেটে ঝোলানো জামাকাপড় হেঁটে যাচ্ছে, ট্যাক্সিডার্মি করা মুখ কিংবা শরীর তার চোখে পড়ে। এলোমেলো আলোয় পড়ছে চলন্ত ছায়া, ভেঙে যাচ্ছে। নানা রাস্তায় ঘুরে বেড়াল শ্যাম। একটিও চেনা মুখ চোখে পড়ে না, একটিও প্রিয় মুখ চোখে পড়ে না। হঠাৎ মনে হয়, একশো বছর একটানা ঘুমিয়ে হঠাৎ জেগে উঠে সে আর কিছুই চিনতে পারছে না।

একশো বছর ধরে পচে গলে ঝরে গেছে চেনা-পরিচয়, একশো বছর ধরে বিস্ফোরিত হয়ে গেছে প্রিয় মুখগুলি। অল্প কুয়াশা জমে আছে চার দিকে, বেশি দূরে চোখ যায় না। মনে হয় কুয়াশা কেটে গেলেই দেখা যাবে বিদেশ। দেখা যাবে, লীলা একা নির্জন রাস্তার শেষে কাচের দরজার ওপাশে তার অপেক্ষায় আছে। তাকে দেখলেই দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসবে, তারপর তাবা দু'জন পরিত্যক্ত জনহীন শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে পরস্পরকে না-ছুঁয়ে। যে-কোনও বাড়িতেই তাদের জন্য সুন্দর বিছানা পাতা থাকবে, দোকানে দোকানে সাজানো থাকবে জিনিস, তারা একবার স্পর্শ করবে বলে গাছে গাছে ফুল ফুটে ফল ফলে থাকবে। তাদের দু'জনের উদ্দেশেই তখন রোদ বা বৃষ্টিপাত ঘটবে পৃথিবীতে।

না, শ্যাম মাথা নাড়ে। পৃথিবীতে এরকম কিছুই ঘটে না। সে জানে। তাই পৃথিবী এখনও মেন সুন্দর নয়। এখনও এখানে রয়ে গেছে কিছু অহংকারী মোটর-সাইক্লিস্ট আর কিছু চোয়াড়ে লোক।

.

হোটেলে আজ মিত্রকে না দেখে সামান্য চমকে গেল শ্যাম। রোজ যে দেখা হয় তা নয়। তবু আজ খেতে বসে বড় একা লাগল শ্যামের। সামনের উলটো দিকের শূন্য চেয়ারটার দিকে চোরা চোখে চেয়ে দেখল অনেকবার। সামান্য সন্দেহে তার মন দুলে গেল। খাবারের তেমন কোনও স্পষ্ট স্বাদ পেল না শ্যাম। খেয়ে গেল।

হোটেলের ম্যানেজার লোকটার সঙ্গে কোনও দিনই প্রায় কথা বলে না শ্যাম। দরজার কাছে একটা খুদে টেবিল কোলে করে বসে থাকে বিনয়ি এবং মোটা থলথলে লোকটি, দুটি ঢুলুঢুলু চোখ, দেখলে মনে হয়, সন্ধের দিকে এক-আধ ছিলিম গাঁজা খায় ম্যানেজার। কথা কম বলে, হাসে অনেক বেশি কিন্তু শব্দ হয় না, কখনও শ্যাম শোনেনি যে লোকটা ছোকরা চাকর কিংবা ঠাকুরকে চেঁচিয়ে বকছে। বস্তুত বকাঝকা করার জন্য আলাদা একজন লোক রাখা আছে—সে-লোকটা চাকরদের ওপরওয়ালা। ম্যানেজার শুধু চুপচাপ

বসে থাকে শান্তভাবে। শ্যাম লক্ষ করেছে, দিনে দিনে লোকটা আরও শান্ত হয়ে যাচ্ছে, নড়াচড়া কমে যাচ্ছে আরও। মুখের হাসিতে আরও বিনয় ও উদাসীনতা ফুটে উঠছে, মুখের কথা কমে গেছে অনেক। লোকটার মাথার ওপরে পিছনের দেয়ালে লোকটার মৃত বাবার একটা ছবি টাঙানো আছে, ছবির চারধারে একটা গত বছরের শুকনো বেলফুলের মালা। মাঝে মাঝে শ্যামের সন্দেহ হয় যে, হয়তো খুব শিগগিরই এ-লোকটাও তার ছেলেকে খুদে টেবিলের কাছে নিজের পুরনো জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে একলাফে উঠে যাবে ওপরের দেয়ালে তার বাবার ছবির পাশে। তারপর ওরকমই একটা শুকনো বেলফুলের মালা পরে ছবি হয়ে যাবে একদিন, খুব শিগগিরই! নয়তো যেখানে বসে আছে। সেখানেই বসে থেকে আস্তে আস্তে একদিন সিমেন্ট কংক্রিটের মতোই জমে যাবে লোকটা ঠান্ডা পাথর হয়ে যাবে, আর নড়বেই না কোনও দিন।

আজ বেরোবার মুখে শ্যাম খুদে টেবিলটার সামনে একটু দাঁড়াল। বাইরের দিকে চেয়ে দেখল, কুকুর—অনেক কুকুর বসে আছে। রোজ যেমন থাকে। অকারণে শ্যাম মৃদু হেসে বলল, আঃ, কুকুর! তারপর এক দুই তিন করে গুনে গেল। এগারোটা।

এত কুকুর! শ্যাম মৃদু হেসে শান্ত লোকটির দিকে তাকাল, এত কুকুরকে আপনি রোজ ভাত দেন?

দিই। বড় বিনয়ে হাসল লোকটি। চোখ বুজে গেল হাসিতে।

এগারোটা কুকুরকে? শ্যাম চোখ বড় করে তাকাল—আপনার খুব বেশি পুণ্য জমে যাচ্ছে! খুব তাড়াতাড়িই পুণ্য করে নিচ্ছেন আপনি, সময় থাকতেই!

বড় বিনয়ে লোকটি ঘাড় কাত করল, বলল, এগারোটার বেশি কমও হয়।

হয়?

হয়। লোকটা বিষণ্ণ চোখে কুকুরগুলোর দিকে তাকাল, বলল, দিনে দিনে বাড়ছে। আরও বাড়বে।

কেন?

কেন! লোকটি চিন্তিত মুখে শ্যামের দিকে তাকাল, খাবার পাচ্ছে না কোথাও। দেশের যা অবস্থা, ক্রমে ক্রমে এখানে এসে জুটছে।

ঠিক। শ্যাম বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে। বস্তুত দেশের খাদ্যাবস্থা বহুকাল হয় শ্যামের আর জানা নেই। তবু লোকটার এত কথা বলা শুনতে তার ভাল লাগছিল।

সব কটাই বাজে কুকুর নয়। লোকটা বলল, লক্ষ করে দেখুন, মাঝখানের সাদা কুকুরটা—ওর গায়ে অনেক বড় বড় লোম এখনও আছে, প্রকাণ্ড ঝোলানো কান, ওটা স্প্যানিয়েলের ক্রস-ব্রিড। আর ওই যে একটা ছাইরঙা, দেখলে আর বোঝা যায় না, ওটা বোসেদের কুকুর ছিল—অ্যালসেশিয়ান। গায়ে ঘা। হয়ে পচে-টচে রাস্তার কুকুর হয়ে গেছে। খুঁজলে মশাই, ওদের মধ্যেও বলতে বলতে হাসল লোকটি, একজন খদ্দেরকে এতক্ষণ দাড় করিয়ে রেখেছিল, তাকে পয়সা গুনে দিতে টেবিলের ওপরটা ডালার মতো তুলে ফেলল।

একটু অপেক্ষা করল শ্যাম, তারপর মুখ তুলতেই বলল, মিত্রকে দেখেননি আজ! সুবোধ মিত্রকে?

অমায়িক হাসল লোকটি; মাথা নাড়ল, না। এখনও আসেননি। বলে সস্নেহে কুকুরগুলির দিকে চেয়ে রইল। শ্যাম লক্ষ করল, কুকুরগুলি বড় স্নেহে এবং ভালবাসায় শান্ত লোকটির দিকে চেয়ে আছে।

আর কথা না বলে বেরিয়ে এল শ্যাম। সে কুকুরগুলির ভিতর দিয়ে হেঁটে গেল, তারা একটু সরে পথ করে দিল। সন্দেহজনক স্প্যানিয়েলটির দিকে একবার আদরের হাত

বাড়িয়েও হাতটা টেনে নিল শ্যাম। তাতেই খুশি হয়ে কুকুরটা ল্যাজ নেড়ে দিল। ভিখিরি ব্যাটা-শ্যাম মনে মনে গাল দিল তাকে।

শ্যামের মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মতো চমকে ওঠে একটা সন্দেহ। কাছেই সুবোধ মিত্রর বাসা। ইচ্ছে করলে একবার ঘুরে আসতে পারে শ্যাম। কিন্তু ইচ্ছে হয় না। যদি তেমন কোনও ঘটনাই ঘটে থাকে, তবে তার গিয়ে কী লাভ? বরং এখন গেলে পুলিশ-টুলিশের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়াই স্বাভাবিক। ভাবতেই ভয়ংকর অলস লাগল শরীর। শ্যাম হাঁটতে হাঁটতে একটু দাঁড়াল। হাই তুলল। যদি ঘটনাটা ঘটেই থাকে তবে বলতেই হয় যে, মিত্র কথা রাখেনি। সতেরোটা ঘুমের বড়ির অর্ধেক বখরা শ্যামের পাওনা ছিল।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল শ্যাম। তার ক'টা বড়ি পাওনা ছিল? হিসেব করলে কটা দাঁড়ায়। আটটা না ন'টা! অর্ধেক নেওয়ার কথা বলেছিল মিত্র, কিন্তু ঠিক ক'টা তা বলেনি। শ্যাম ভেবে দেখল, আর-একজনকে দলে নিলেও ঠিক ঠিক তিন ভাগ করা যাচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে বড় সমস্যায় পড়ে গেল শ্যাম। সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোল যে, ভাগ-বাঁটোয়ারার ক্ষেত্রে সতেরো সংখ্যা বিশ্রী। তারপর আবার হাঁটতে লাগল।

পৃথিবী অনেক নির্জন হয়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে আরও যাবে। আস্তে আস্তে তার একার হয়ে যাবে সবকিছু। মিত্রকে দিয়ে শুরু হল হয়তো বা। কিংবা ঠিক তা নয়—আরও আগে থেকে—

তার মাথার ভিতরে অমনি বগরী পাখির মতো গুরু গুরু করে ডেকে উঠল একটি প্রায়-ভুলে-যাওয়া মোটরসাইকেলের আওয়াজ। মৃত্যুকূপে সেই খেলার মতো ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে আবার নীচে নেমে যেতে লাগল। শ্যাম দ্রুত হাঁটতে থাকে।

১২. হয়তো একদিন পৃথিবীতে

হয়তো একদিন পৃথিবীতে খুব সুসময় এসেছিল। তখন শ্যাম ছিল না। হয়তো একদিন পৃথিবীতে খুব সুসময় এসে যাবে। তখন শ্যাম থাকবে না। কেমন ছিল সেই সুসময় কে জানে! কিংবা কে জানে কেমন হবে সেই সুসময়! শ্যাম জানে না। মাঝে মাঝে সে কেবল তার চারধারে দেখতে পায় সেইসব সুসময়ের অনেক চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে। যেমন পাখির মুখ থেকে খসে পড়া ফসলের বীজ দেখে বোঝা যায় যে, কাছাকাছি এইখানে কোথাও ফসল ফলেছিল, যেমন আকাশের মেঘ দেখলে বোঝা যায় আমাদের বীজক্ষেত্রে বৃষ্টি হবে।

কিংবা কে জানে এইটাই সেই সবচেয়ে সুসময় কি না যা শ্যাম পেরিয়ে যাচ্ছে!

দুপুর রোদ মাথায় করে শ্যাম তার রোজকার পরিচিত থামটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এত আলোর মধ্যেও তার মনে হচ্ছিল যে, চারধারে ছায়ার মতো অলীক অনর্থক মানুষেরা অকাজে হেঁটে যাচ্ছে। সবকিছুই বস্তুত অবাস্তব, একমাত্র সামনের ওই কাচের দরজাটা ছাড়া। ওপাশে লীলা বসে আছে। ব্যস্ত কর্মঠ তার দুটি সাদা সুন্দর হাত, অল্প গম্ভীর ও বিষণ্ণ তার মুখ। শ্যাম জানে লীলা এখনও কোনও সিদ্ধান্তে আসেনি। এখনও বড় দয়ালু ওর মন, আঘাত করার আগে তাকে সতর্ক হওয়ার সময় দিচ্ছে। শ্যাম জানে, খুব শিগগিরই একদিন রাস্তার লোকেরাই তাকে ঘিরে ধরবে, চোখ পাকিয়ে তাকে সরে পড়তে বলবে। শুধু যতদিন তা না ঘটবে ততদিনই বড় সুসময়। সবচেয়ে সুসময়।

তারপর একদিন হয়তো সে ইরফানের কাছে সোজা গিয়ে বলবে, আমি পাকিস্তানে চলে যাব। আমাকে সীমানা পার করে দাও।

কিংবা সে হয়তো ঘুরে ঘুরে কষ্টেসৃষ্টে জোগাড় করার চেষ্টা করবে সতেরোটা ঘুমের বড়ি যা হাতে নিলে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া যায়, বালিশের পাশে নিয়ে শুলে কেটে যায় ভয় কিংবা ভবিষ্যৎ-চিন্তা।

কী করবে তা ঠিক জানে না শ্যাম। কেবল মনে হয়, এখনই হয়তো সবচেয়ে সুসময়।

আজও লীলা কাচের দরজার সামনে এসে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। দ্বিধা! কিংবা অপেক্ষা! তারপর শ্যামকে আপাদমস্তক চমকে দিয়ে দরজা খুলে লীলা রাস্তায় নেমে এল। একা। ধীর পায়ে হেঁটে যেতে লাগল।

প্রথমে কিছুক্ষণ এটা বিশ্বাস করল না শ্যাম। তারপর বুঝল মেয়েটা লীলাই, এবং সে একা হেঁটে যাচ্ছে। ধীর পায়ে।

নিঃশব্দে শ্যাম তার থামে হেলানো শরীব তুলে আনল। তার শরীর কাঁপতে থাকে, নানা রহস্যময় অনুভূতি তার ভিতরে খেলা করে যায়। তার খুব জোরে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে, হাঁটু গেড়ে বসে তার কাঁদতে ইচ্ছে করে। তুমি লীলা! তুমি কি লীলা! আমার সঙ্গে এক সমতলে তুমি হেঁটে যাচ্ছ। একা।

নিঃশব্দে বেড়ালের মতো পায়ে, গোয়েন্দার মতো সন্ধানী চোখে লীলাকে রেখে, ভিড়ের ভিতরে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করে শ্যাম হাঁটে। হেঁটে যায়।

গাঢ় বাদামি জমির ওপর ফ্যাকাশে কলকা এবং আরও নানা জ্যামিতিক ছাপ দেওয়া একটা শাড়ি পরেছে লীলা, মোটা একটা বেণিতে বাঁধা তার চুল। পিছন থেকেও লীলাকে বড় পবিত্র দেখাচ্ছে। অলস মন্থরভাবে সে হাঁটছে, বাঁ হাতটা বুকের ওপর গোটানোবোধ হয় সে তার সাদা ব্যাগটা বুকে চেপে ধরে আছে, গলায় জড়ানো কাশ্মীরি স্কার্ফের আঁচল উড়ছে হাওয়ায়।

রাস্তায় ভিড়, তবু ভিড়টাকে যথেষ্ট বলে মনে হয় না শ্যামের। তার এবং লীলার মধ্যে অনেকটা শূন্য জমি। লীলা ঘাড় ঘোরালেই চোখাচোখি হয়ে যেতে পারে। তার শুন্য বুকের ভিতরে লাফিয়ে ছুটছে হরিণ, শরীরের ভিতরে রহস্যময় মেঘ ডেকে ওঠে, বৃষ্টি নামে, কালো একটা রেলগাড়ি খুব লম্বা একটা পুল পেরোতে থাকে। যদি চোখাচোখি হয়—যদি চোখাচোখি হয়ে যায়। যদি কথা বলে লীলা! যদি প্রশ্ন করে, তুমি কে?

ভাবতেই জড়িয়ে আসে শ্যামের হাত-পা। খালি রাস্তায় সে হোঁচট খায়। হাসে। আবার হাঁটে। তা হলে ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটে যাবে, অদৃশ্য থেকে নেমে আসবে এক ঢল জলের প্লাবন, হয়তো বা কথা বলে উঠবে রাস্তাঘাট! আর তখন নিশ্চিত নিজের পরিচয় ভুলে যাবে শ্যাম, লীলার সামনে দাঁড়িয়ে পাঠ-ভুলে-যাওয়া বাচ্চা ছেলের মতো ভীত চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। বিড় বিড় করে বলবে—প্রশ্ন কোরো না আমি কে। আমি জানি না।

সামনের মোড়ে রাস্তা পার হওয়ার অপেক্ষায় ভিড় জমে আছে। পুলিশের উত্তোলিত হাত চলন্ত গাড়িগুলো আটকে দিল। লীলা সামান্য থেমে আবার হাঁটে। রাস্তা পার হয়। ধীর মন্থর তার গতি কোনওখানে যাওয়ার তাড়া বা লক্ষ্য নেই তার। চারধারে অর্থহীন অলীক ছায়ার মতো লোকজন। শ্যাম এদের কাউকেই চেনে না, জানে না এরা বাস্তবিক আছে কি না। এরাও কি তা জানে! শ্যাম এইসব ছায়া ভেদ করে হেঁটে যায়। বাসস্টপ থেকে কারা যেন লীলাকে উদ্দেশ করে বলে, বাঃ বেশ। অমনি গরগর করে ওঠে শ্যাম, অন্ধের মতো রুখে ঘুরে দাঁড়ায়, ফিস ফিস করে চাপা হিংস্র গলায় বলে, সাবধান! আমি পাহারায় আছি। হাসে। আবার হাঁটতে থাকে। নিজেকে বড় জীবন্ত মনে হয় তার। শরীরের ভিতরে কলকারখানা চলার আওয়াজ। সুসময়...পৃথিবীতে এটাই বোধহয় সবচেয়ে সুসময় যা শ্যাম পেরিয়ে যাচ্ছে।

লীলার গতি ক্রমে আরও মন্থর হয়ে আসে। সে অন্যমনে ফুটপাথের আরও ধার ঘেঁষে যায়, মুখ ফিরিয়ে শো-কেসের জিনিস দেখতে দেখতে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে যায়, মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা দেখে, তারপর পা পা করে হাঁটতে থাকে। লীলাকে যতটা অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে ততটা সে নয়— শ্যাম জানে। লীলার শরীর সতর্ক, কান উদগ্রীব

সে জানে যে, শ্যাম তার পিছনে আছে। খোলামেলা রাস্তায় একা অরক্ষিত লীলা। কে জানে লীলা তাকে নিঃশব্দে বলছে কিনা-কাছে এসো। ভাল করে দেখতে দাও তোমার মুখ। তোমরা কি হিন্দু? তোমরা কী গোত্র? তোমার নাম পরিচয় আমাকে বলো। তোমার বাড়ি-ঘরদোরের অবস্থা আমাকে বলো। তোমরা ক' ভাইবোন? আর তোমার চাকরি...?

এ-সবকিছুই খুব জরুরি প্রশ্ন। লীলার জানা দরকার। শ্যাম তাই মনে মনে উত্তর দিয়ে দেয়–শ্যাম চক্রবর্তী আমার নাম, বাবা কমলাক্ষ চক্রবর্তী আমরা শাণ্ডিল্য গোত্র, বিক্রমপুরের বানিখাড়া গ্রামে আমাদের বাড়ি...না আমার ভাই নেই, এক বোন, মুর্শিদাবাদে তার বিয়ে হয়েছিল, তারপর আর খবর জানি না...সেইন্ট অ্যান্ড মিলারে আমি ছিলাম ছোটসাহেব, ওপরওয়ালা বাস্টার্ড বলে গাল দেওয়ায় আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলাম...তবু সত্যি বলতে কী আমি জানি না আমি কে কিংবা আমি কীরকম...

লীলা আস্তে আস্তে হাঁটে, যে-কোনও দোকানের সামনে একটু দাঁড়ায়, শো-কেস দেখে নেয়, আবার হেঁটে যায়। সাহসী লোকেরা তার কাছ ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছে।

ক্রমে লিন্ডসে স্ট্রিটের কাছে চলে এল তারা। রাস্তা ক্রমে ফাঁকা হয়ে আসছে। রাস্তা পার হওয়ার আগে লীলা একবার ফিরে তাকায় অন্যমনে। অবহেলার চোখ তাচ্ছিল্য ফুটে আছে। পরমুহূর্তেই চোখ সরিয়ে নেয়। তবু বঁড়শির মতো সেই দুটি চোখ শ্যামের বুকের মধ্যে গেঁথে যায়। তার শরীর যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে। বুকের মধ্যে হঠাৎ জলোচ্ছ্বাস ফুলে ফেঁপে ওঠে। তার শ্বাসকষ্ট হতে থাকে।

নিঃশব্দে লীলা বলে ওঠে, কাছে এসো।

শ্যাম আপনমনে মাথা নাড়ে। না। আমি জানি কাছে যেতে চেষ্টা করলে চারদিকের বাড়িঘর কেঁপে উঠবে, মাঠ ময়দান থেকে শিকড় ছিঁড়ে ছুটে আসবে গাছপালা, বাতাস আর্তস্বরে চেঁচিয়ে বলবে, রক্ষা করো, রক্ষা করো; আমি জানি, এখানে নয়, অন্য কোনও

সুন্দর পৃথিবীতে আমাদের দেখা হওয়া ভাল। এখানেনয়– এত লোকজন আর এত ভিড়ের মধ্যে নয়। দেখো একদিন খুব শিগগিরই আমি পৃথিবীতে সুসময় এনে দেব।

সে লীলার নিঃশব্দ স্বর শুনতে পায়, কথা বলো।

না। মাথা নাড়ে শ্যাম। এখনও নয়। তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যই আমি আলাদা একটা ভাষা তৈরি করব, দেখো। সেই ভাষায় থাকবে না কোনও কঠিন, রূঢ় কিংবা অশ্লীল শব্দ, তাতে থাকবে না কোনও গালাগাল। এখনও মানুষের ভাষা তেমন সুন্দর নয়। এখনও তাদের জানা বহু শব্দ রয়ে গেছে যা রহস্যময়, কিংবা যা রাগ ও বিদ্বেষের, যা অবহেলা কিংবা প্রত্যাখ্যানের। আগে তুমি সেই সব শব্দ ভুলে যাও, তারপর...

লীলা রাস্তা পার হল না। বাঁয়ে মোড় ঘুরল। কয়েক পা হেঁটে একটা খোলা দরজার সামনে দাঁড়াল হঠাৎ। পিছনে ফিরে অন্যমনস্ক চোখে একবার চারদিক দেখে নিল। তারপর দরজার ভিতরে চলে গেল।

শ্যাম ধীরে ধীরে দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ায়। ভিতরে কেবল দেখা যাচ্ছে একটা সরু সিঁড়ি স্টিমারের সিঁড়ির মতো সুন্দর, লোহার চকচকে পাত বসানো, মসৃণ রেলিং, খুব উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। সিঁড়িতে লীলা নেই। উঠে গেছে। নতুন রঙের গন্ধ পাওয়া যায়, আর মৃদু খুব মৃদু পাউডারের গন্ধ।

এটা কি রেস্তরাঁ।শ্যাম কয়েক পা পিছিয়ে এসে দরজার ওপরে দেখল– রেস্তরাঁ। সাইন বোর্ডে নাম লেখা আছে। শ্যাম জানে এখানে লীলার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে। শ্যামের জানা দরকার নোকটা কে! সে আশেপাশে তাকিয়ে দেখল কোনও মোটর-সাইকেল দাড় করানো আছে কি না। নেই।

কোনও দ্বিধাই বোধ করল না শ্যাম। আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল।

.

হলঘরের মতো প্রকাণ্ড একটা ঘর। এত উজ্জ্বল আলো জ্বলছে যে শ্যামের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পেয়ালা পিরিচ চামচ কিংবা টেবিলের কাচের চাদর থেকে ঠিকরে এসে আলো তার চোখে আলপিনের মতো বেঁধে। কিছুক্ষণ সে ভাল করে লীলাকে দেখতে পেল না। সে তার রুক্ষ চেহারা এবং এলোমেলো পোশাকে এই ঝকঝকে ঘরে বেমানান কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর লীলাকে দেখতে পেল সে। প্রায় ফাঁকা রেস্তরাঁ। কয়েকটিই মাত্র লোক ছড়িয়ে বসেছে, একেবারে কোনও দূরের টেবিলে বসছে লীলা, টেবিলের ওপর অল্প নোয়ানো কাধ, মুখ নিচু–যেন টেবিলের কাচে সে তার মুখের ছায়া দেখছে। না, লীলা একা নয়, তার মুখোমুখি উলটো দিকের চেয়ারে বসে আছে সুন্দর চেহারার একটি লোক।

অরুণ না! ভ্রূ কুঁচকে শ্যাম দেখে, তারপরে মৃদু হাসে। হ্যাঁ, অরুণই।

অরুণ তাকে প্রথম দেখতে পেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো লাফিয়ে উঠল অরুণের, কপালে পড়ল ভাজ। মুখ সামান্য ফঁক হয়ে রইল একটুক্ষণ। শ্যাম বুঝল না, কেন এরকম হল অরুণের! সে মৃদু হাসিমুখে চেয়ে রইল অরুণের দিকে।

সামান্য ফিসফিস করে অরুণ বলল, শ্যাম! অনেকক্ষণ পর হাসল, আয়। আশ্চর্য যে, লীলা তার দিকে ফিরেও তাকাল না।

অরুণের ডাকটাকে গ্রাহ্য করল না শ্যাম। মাঝখানের তিনটে টেবিল সে বাদ দিয়ে বসল। একা। এক কাপ চায়ের কথা বলে দিল বুড়ো বেয়ারাকে।

আড়চোখে সব কিছু লক্ষ করে শ্যাম। অরুণের মুখ অল্প লাল। তাকে লাজুক আর ভিতু দেখাচ্ছে। খুবই আশ্চর্য হল শ্যাম। এরকম হওয়ার কথা ছিল না। তার নিজের অতীতের মতোই অরুণের চরিত্র–সে জানে। অন্য কোনও লোকের বদলে অরুণকে দেখে শ্যাম বরং স্বস্তি পায়। শ্যাম জানে যে, সে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ অরুণের কাছ থেকে লীলার কোনও ভয় নেই। শ্যাম নিজে অরুণের চেয়ে অনেক পাকা লোক ছিল।

সে লক্ষ করল, অরুণ কথা বলছে না লীলার সঙ্গে। সে কাঁটা চামচ দিয়ে এক টুকরো আলুর বড়া মুখে পুরে ভয়ংকর জোরে উত্তেজিত ভাবে চিবোচ্ছে। ঝনন করে তার চামচ পিরিচের সঙ্গে ঠুকে শব্দ করে ওঠে। অকারণে রুমালে মুখ মোছে অরুণ, তার চোখ লীলার নোয়ানো মাথার ওপর দিয়ে সামনের দেয়ালে ঘুরে বেড়ায়। সুন্দর চেহারা আর সুন্দর পোশাকে অরুণের ওই ভাবভঙ্গি খুব বেমানান লাগে শ্যামের কাছে।

লীলা খুব ঠান্ডা এবং সহজ ভঙ্গিতে বসেছে এখন। নোয়ানো মাথা তুলে অরুণের দিকে চেয়ে দেখছে। তার মুখে একটু স্মিত কৌতুকের ভাব। হঠাৎ সে তার একটু তীক্ষ্ণ পাখির মতো মিষ্টি গলায় স্বাভাবিকের চেয়ে একটু জোরে বলল, আপনি আমাকে ডেকেছিলেন।

অরুণ সামান্য অস্থির অস্বস্তির হাসি হাসে, মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

আমি এসেছি।

খুব মৃদু গলায় অরুণ কিছু বলল। শ্যাম শুনতে পেল না। শুধু দেখল, অরুণের কথার উত্তরে লীলা শুধু মাথা নেড়ে জানাল, না।

লীলাকে কেন এখানে ডেকে এনেছে অরুণ তা শ্যাম বোঝে। তবু লীলাকে খুব শান্ত ও দৃঢ় দেখায় যেন লীলার সঙ্গে আছে কোনও সমর্থ লোক, যে লীলাকে আপদে রক্ষা করবে। লীলার চোখে-মুখে সেই প্রত্যয় দেখে শ্যাম। লক্ষ করে, অরুণ তার শুকনো ঠোঁট চাটছে, এবং বোকার মতো এড়িয়ে যাচ্ছে শ্যামের চোখ। শ্যাম মৃদু হাসে। তার সামনের টেবিলে রাখা এক কাপ চা আস্তে আস্তে জুড়িয়ে যেতে থাকে।

ওরা আর কথা বলে না। চুপচাপ বসে থাকে। লীলার সামনে রাখা খাবারের প্লেট পড়ে থাকে। শ্যাম একটু বিস্মিত হয়– লীলা কি জানে না যে শ্যাম তার খুব কাছেই বসে আছে।

লীলা জানে। একটু পরেই শ্যাম সেটা টের পায়।

বাঁ হাতে জলের গ্লাস ধরে ডান হাতে লীলা তার বেণিটা বুকের ওপর টেনে আনে। ওইভাবে কৌশলে ঘাড় কাত করে অরুণের অজান্তে লীলা হঠাৎ সোজা শ্যামের দিকে তাকায়। যেন লীলা একবারও ঘাড় না ঘুরিয়েই জানত শ্যাম কোথায় বসে আছে। তার চোখের ওপর লীলার চোখ ঝলমল করে ওঠে। আর সেই মুহূর্তে খুব চমকে উঠে শ্যাম দেখতে পায়, লীলা একটু হেসেই হাসিটা ঠোঁটে টিপে দিল, তার চোখ আঙুলের মতো একটু সংকেত করে দেখিয়ে দিল অরুণকে। নিঃশব্দে কয়েক পলকে এইসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। তারপরই স্বাভাবিকভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল লীলা।

আস্তে আস্তে বুঝতে পারে শ্যাম। বুঝতে পারে আজ বিকেলে ইচ্ছে করে কেন একা ধীরে ধীরে এতদুর হেঁটে এল লীলা। লীলা জানত শ্যাম তার পিছু নেবে। তাই এতদূর কৌশলে তাকে টেনে এনেছে লীলা। লীলা ঘাড় না ঘুরিয়েও জানত যে, সে খুব কাছেই বসে আছে। লীলা জানে যে, যে-কোনও আপদে-বিপদে শ্যাম তাকে রক্ষা করবে। তাই সে কৌশলে শ্যামকে বলে দিল—এই লোকটার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।

নিজের ভিতরে শীতল এক নিষ্ঠুরতা অনুভব করে শ্যাম। দুটি মুষ্টিবদ্ধ হাতের মতো শক্ত হয়ে যায় তার চোয়াল। সে অরুণের দিকে চেয়ে থাকে। তার রক্তে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে। আর একটিমাত্র ইঙ্গিতের জন্য তার সমস্ত শরীর প্রস্তুত থাকে।

মৃদু স্বরে কথা বলে অরুণ। বিরক্তিতে মাথা ঝাকায় লীলা। না। না, না। তারপর কিছুক্ষণ এরকম চলে। শান্তভাবে বসে থাকে শ্যাম। অপেক্ষা করে। তার মাথার ভিতরে ধীরে ধীরে আর সব বোধ লুপ্ত হয়ে যায়, শুধু কুয়াশার মতো জমে ওঠে রাগ।

শ্যাম দেখে, অরুণ বিল মিটিয়ে দিচ্ছে। টেবিলের ওপর থেকে সাদা হাতব্যাগ তুলে নিচ্ছে লীলা। ওরা উঠে দাঁড়াল। ওরা হেঁটে এল, সামনে লীলা। একবার-সেটাও ভুল হতে পারে মাত্র একবার শ্যামের মনে হল, লীলার চোখ তার টেবিলের একটা কোণ ছুঁয়ে গেল।

অরুণ তার দিকে চেয়ে হাসল। সে হাসিতে কোনও ইচ্ছা বা প্রাণ নেই। সেই উঁচু ফিসফিস স্বরে বলল, শ্যাম! একটু দ্বিধায় দাঁড়াল, বলল, পরে কথা হবে।

লীলা ফিরে তাকাল না। তার দরকারও নেই। শ্যাম বোঝে।

সিঁড়ির চৌখুপিতে ওরা নেমে গেলে উঠে দাঁড়াল শ্যাম। তাড়াতাড়ি একটা ট্রে হাতে ছুটে এল বুড়ো বেয়ারা। বিরক্তিকরভাবে পথ আটকাল। পকেটে হাত দিয়ে খুচরো পয়সা যতখানি হাতে পেল, তুলে এনে ঝনাৎ করে তার ট্রে-তে ফেলে দিল শ্যাম। তারপর আর ফিরেও তাকাল না।

নীচে নেমে এসে দেখল কোথাও কেউ নেই, তাড়াহুড়ো করে ওদের খুঁজল না শ্যাম। ধীরে ধীরে হেঁটে এসে নিশ্চিন্ত মনে বাস ধরল।

হোটেলে ঢুকে ভূত দেখে আঁতকে উঠল শ্যাম। সুবোধ মিত্র! অনেককালের পুরনো বন্ধুর মতো হাসল মিত্র।

কাল আসেননি। শ্যাম জিজ্ঞেস করে।

না। মিত্র মাথা নাড়ে, কাল একটা বরযাত্রী গিয়েছিলুম।

শ্যাম উলটো দিকে মুখোমুখি বসে।

মিত্র বলল, কাল একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখলুম মশাই। বরযাত্রী গিয়েছিলুম পুটিয়ারি পশ্চিম না দক্ষিণ ঠিক মনে নেই, টালিগঞ্জের খাল পেরিয়ে যেতে হয়। ও-সব গ্রাম-গঞ্জ ছিল কিছুকাল আগেও। কিন্তু গিয়ে শুনলুম ওটাও নাকি কলকাতা…হাঃ হাঃ–দু’দিন পরে আপনি যে-দিকেই যাবেন, যতদূর যাবেন, দেখবেন কলকাতা আর কলকাতা…কলকাতার শেষ নেই আর…লাফিয়ে লাফিয়ে শহর বেড়ে যাচ্ছে মশাই, গ্রাম-গঞ্জ খেত-খামার যা পাচ্ছে হাতের কাছে তাতেই স্ট্যাম্প মেরে দিচ্ছেক্যালকাট্টা!…হাঃ হাঃ…বাড়তে বাড়তে একদিন এই কলকাতাই না দুনিয়াময় হয়ে যায়!…হাঃ

হাঃ...এতকাল কলকাতার মাঝখানে থেকে টেরও পাইনি যে, কলকাতা কেমন বেড়ে যাচ্ছে চারদিকে! এর পর আর কলকাতার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলেও যাওয়া যাবে না মশাই, খুব অদ্ভুত ব্যাপার হবে, দেখবেন! তখন পাহাড়ে যাবেন তাও কলকাতায়, সমুদ্রে যাবেন তাও কলকাতায়; তখন কলকাতায় জন্মে সারাজীবন কলকাতাতেই ঘুরে মরবে লোক...হাঃ হাঃ...

খাওয়া হয়ে গেলে একসঙ্গে বেরোল দু'জন। শ্যাম গুনে দেখল আজ পনেরোটা কুকুর। সে হঠাৎ বলল, কুকুর খুব বেড়ে যাচ্ছে, দেখেছেন!

হা। মাথা নাড়ে মিত্র। হেসে বলে, আমাদের ম্যানেজার লোকটা খুব কুকুরভক্ত। তারপর একটু গলা নামিয়ে বলল, বোধহয় রোজ মহাভারত পড়ে...হাঃ হাঃ...

.

মিত্রকে গড়িয়াহাটায় ছেড়ে দিয়ে ঘরের দিকে ফিরল শ্যাম। দূর থেকেই দেখল বাসার সামনে রাস্তার ফুটপাথে অরুণ দাঁড়িয়ে আছে। তার টাইয়ের নট' ঢিলে হয়ে গেছে, রাস্তার মৃদু আলোতে তার মুখটা লাল আর চোখ দুটো হতভম্ব দেখায়।

ওঃ শ্যাম! অরুণ সামান্য টলমলে পায়ে এগিয়ে আসে, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বোকা-হাসি হাসে, ততার সঙ্গে কথা আছে...

শ্যাম তার হাত ছোঁয় না। দাঁড়িয়ে স্থির চোখে তাকে দেখে। নিজের ভিতরে শীতল এক নিষ্ঠুরতাকে অনুভব করে সে। ঠান্ডা গলায় বলে, আয়।

হুইস্কির চেনা গন্ধ পায় শ্যাম। সামান্য অস্থির পায়ে অরুণ তার পিছনে হেঁটে আসে। আসতে আসতে কথা বলে, ওঃ, শ্যাম, আমার বড় কষ্ট রে। আমি আর পারছি না রে।

হুইস্কির চেনা গন্ধবহু দূর অতীত থেকে ওই গন্ধ ভেসে আসছে। স্বাদ ভুলে গেছে শ্যাম। ভাবতে ভাবতে সে সিঁড়ি ভাঙে। পিছনে অরুণ।

ঘরে ঢুকে অরুণ হাঁফায়, বিছানায় বসে পড়ে, তারপর বালিশ টেনে নিয়ে আধশোয়া হয়। তার সুটের ভাজ নষ্ট হচ্ছে, সেদিকে তবু খেয়াল করে না অরুণ। বলে, তুই দেখেছিস। তুই সব দেখে বুঝে নিয়েছিস শালা...তোকে আমি...বলতে বলতে আবার দৃষ্টি শূন্য হয়ে যায় অরুণের। হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে।

শ্যাম তার চেয়ার জানালার কাছে টেনে আনে, তার ওপর একখানা পা তুলে দিয়ে দাঁড়ায়। অরুণকে দেখে।

কী বলছিল তা ভুলে গিয়ে অরুণ বলল, ওঃ তোকে আমার শ্বশুরের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, না? তোর হয়ে যাবে শ্যাম, তুই ভাবিস না। আমি বাইরে যাওয়ার আগে তোকে বসিয়ে দিয়ে যাব। বোকার মতো অর্থহীন হাসি হাসে অরুণ, আমি অনেক কিছু পারি, জানিস। আমি শালা অনেক কিছু...ধীরে ধীরে চোখ বোজে অরুণ। বমি করার আগের মুহূর্তের মতো শরীর কেঁপে ওঠে তার, চোখ ঠিকরে ওঠে, মুখ লাল। আবার সামলে যায় অরুণ। হাঁফায়। বলে, তবু কী বলব, ওই বুড়োটাকে আমি ভয় পাই, ওই শালা বুড়ো আমার সবকিছু হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে আছে, ইচ্ছে করলে ও আমায় বাঁদরনাচ নাচাতে পারে, শালা হারামির বাচ্চা...বলতে বলতে আবার বমির ভাব সামলে নেয় অরুণ– আমার পিছনে লোক লাগিয়েছে শালা, শাসিয়েছে দরকার হলে আমাকে গুতা দিয়ে মারবে...

কে! শ্যাম ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করে।

আমার বউয়ের বাপ। শালা শ্বশুর...শালা একটা সুন্দর মেয়ের জন্ম দিতে পারেনি মাইরি, তবু শালা শ্বশুর! আমার শ্বশুর!...তুই ভাবতে পারবি না শ্যাম, আমার বউটা কী কুচ্ছিত, ঘর অন্ধকার করে দেওয়ার চেহারা!...তবু আমাকে ইন টাইম ঘরে ফিরতে হবে শালা, না হলে আমি চরিত্রহীন!...আমার বউটাকে যদি তুই দেখতিস শ্যাম। ও যদি অ্যাডালটারি করতে চায় শেয়ালেও ঘেঁবে না ওকে...বলতে বলতে বিছানা থেকে মুখ বের করে মাথা

নামায় অরুণ। সমস্ত শরীরে হেঁচকি তোলার মতো কাঁপুনি। শ্যাম লক্ষ করে, ঘোলা জলের স্রোত অরুণের মুখ থেকে কলের জলের মতো ধারায় নেমে এসে ভাসিয়ে দিচ্ছে তার ঘরের মেঝে। মুহূর্তেই হুইস্কি আর টক বমির গন্ধে ঘর ভরে যায়। বিষিয়ে ওঠে বাতাস। শ্যাম তবু একটুও নড়ে না। পাথরের চাঙড়ের মতো স্থির দাঁড়িয়ে থেকে অরুণকে লক্ষ করে।

ধীরে ধীরে মুখ তোলে অরুণ। কোনও দ্বিধা না করে শ্যামের বালিশ থেকে ময়লা তোয়ালেটা তুলে নিয়ে মুখ মোছে, আবার সেটা বালিশে পেতে দেওয়ার চেষ্টা করে। তারপর অধৈর্য ক্লান্ত একটা হাত বাড়িয়ে বলে, সিগারেট!

শ্যাম তার সস্তা সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বিছানায় ছুড়ে দেয়। অনেক কষ্টে সিগারেট ধরায় অরুণ, আগুনের ফুলকি ঠিকরে পড়ে বিছানায়।

আমার শরীরে শালা চিতাবাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তবু শালা আমাকে ইন টাইম ঘরে ফিরতে হবে, তারপর ওই কুচ্ছিত বউটা...মাইরি, একটু লাবণ্য নেই, ডায়েট কন্ট্রোল না করেও এমন হাড়গিলে...ওঃ অ্যামেরিকা...

বালিশে মাথা গুঁজে দেয় অরুণ। কিছুক্ষণ যেন স্বপ্নের ঘোরে একটু হাসে। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তোলে আবার। অপরিচিতের চোখে শ্যামের দিকে ঐ কুঁচকে তাকায়, শ্যাম।

তারপর কথা ভুলে গিয়ে আবার হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে।

তুই জানিস না শ্যাম, আমার পিছনে লোক লেগে আছে। কিছুতেই সেই লোককে ধরতে পারছিনা। আমার সব খবর সে দিয়ে দিচ্ছে শালা বুড়োকে। আমি রেস্তরাঁর পর রেস্তরা পালটাচ্ছি, কত গলিঘঁজিতে চলে যাচ্ছি মেয়েছেলে নিয়ে, কত অচেনা জায়গায় যাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই পালাতে পারছি, লুকিয়ে থাকতে পারছি না। বুড়ো আমাকে দাড় করিয়ে আমার সারাদিনের সব গোপন রিপোর্ট আমাকেই শুনিয়ে দিচ্ছে।...মাইরি, তারপর

চাকরবাকরের মতো ট্রিট করছে, বাচ্চা ছেলের মতো ধমকাচ্ছে...। কী করে যে খবর পাচ্ছে...

তারপর হঠাৎ হাসে অরুণ, দাঁড়া শালা, একবারই আমি শালা পালাব, ভিসাটা হাতে পাই, তারপর জেটইওর ওয়ে টু অ্যামেরিকা...ভোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ...।

যে-হাতে এরোপ্লেনের ভঙ্গি করে দেখাল অরুণ, সেই হাতটাই হঠাৎ মুঠো পাকিয়ে চাপা গলায় বলল, কিন্তু কে খবর দিচ্ছে। আমি শালা কিছুতেই ধরতে পারছি না, কে!...রাস্তায় হাঁটি, রেস্তরাঁয় বসি, বারে যাই, কিন্তু সবসময়ে আমার ঘাড় সুড় সুড় করে, পিঠের চামড়ায় যেন কার চোখ টের পাই। সবসময়ে ভয়-ভয়, চিন্তা, টেনশন। কে খবর দিচ্ছে। কে!

বাতাসে শূন্য চোখে চেয়ে অরুণ জিজ্ঞেস করে, কে! তারপর আবার ককিয়ে ওঠে, তুই জানিস না শ্যাম, অ্যামেরিকা যাওয়ার মাঝপথ থেকে ওই বুড়ো আমাকে ফিরিয়ে আনতে পারে। ইচ্ছে করলে তছনছ করে দিতে পারে আমার ক্যারিয়ার, যখন খুশি ভয় দেখাতে পারে আমাকে...মেয়ের নামে তিনটে বাড়ি দিয়েছে শালা, দুলাখ টাকা। আমি শালা বড়লোক। কিন্তু সব কেড়েকুড়ে নিতে পারে আবার। ইচ্ছে করলে...ইচ্ছে করলে আমাকে হাওয়া করে দিতে পারে...অথচ আমার শরীরে চিতাবাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটা সুন্দর মেয়ের জন্য...একটা সুন্দর কিছুর জন্য...আমি শালা...

আস্তে আস্তে চোখের জল ঝরে পড়ে অরুণের। কোনও শব্দ হয় না, শুধু ঠোঁট দুটো কাপে। শ্যাম স্থির দাঁড়িয়ে দেখে। আস্তে আস্তে শ্যামের দিকে তাকায় অরুণ, ফোঁপানো গলায় বলে, তুই আজ আমাকে দেখেছিস!

শ্যাম মাথা নাড়ে। হ্যাঁ।

অরুণ বলে, তোকে দেখে আমি চমকে গিয়েছিলাম। বলে অস্বস্তির হাসি হাসল, অনেক দিন তোর খোঁজখবর রাখিনি, জানি না সত্যিই এখন কী করছিস। সেদিন তোর সঙ্গে

দেখা হলে অনেক কথা বলে দিয়েছিলাম। আজ তাই হঠাৎ তোকে দেখে কেমন যেন মনে হল তুই-ই আমার শ্বশুরের সেই লোক। বলে হাসে অরুণ, তোকে পাকা মস্তানের মতো দেখাচ্ছিল।

উত্তর দেয় না শ্যাম। স্থির দাঁড়িয়ে অরুণকে দেখে।

আস্তে আস্তে অরুণের মুখ থেকে হাসি সরে যায়। ভিখিরির মতো গলায় সে বলে, আমি তোর জন্য সব করব শ্যাম। আমি অনেক কিছু পারি। আমি শালা পালাতে চাই। একবার যেতে পারলে আমি আর ফিরব না।...ওই কুচ্ছিত বউ, ওই হারামি বুড়ো আর এই ভিখিরির দেশ ছেড়ে পালাতে পারলে শালা...আবার আমি বড়লোক হয়ে যাব। বলে অসহায়ভাবে চারদিকে তাকায় অরুণ, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে, আমার এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। এখনও আমার বয়স আছে...কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যাবে শ্যাম, যদি তুই একবার ফোন তুলে বুড়োকে বলে দিস যে, আমি আজ লীলার সঙ্গে ছিলুম বিকেলে...

হঠাৎ আবার শ্যামের বুকের মধ্যে গুর গুর করে মেঘ ডেকে ওঠে, চমকে ওঠে বিদ্যুৎ। হরিণ দৌড়োয়। আর কালো একটা রেলগাড়ি লম্বা একটা রেল পুল পেরিয়ে যেতে থাকে।

ধীর শান্ত গলায় সে প্রশ্ন করে, তুই লীলাকে কখনও ছুঁয়েছিস?

আঁ! বলে অরুণ অর্থহীন চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর দুঃখে মাথা নাড়ে, না। তারপর বদমাশের মতো হাসে, সি ইজ ইন লাভ। ততার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলেছিলুম, না? করবি আলাপ?

শ্যাম আবার বলে, আজ বিকেলে কী কী হয়েছিল?

নাথিং। হাসে অরুণ, আমরা ভাইবোনের মতো ছিলুম। বলে বড় করে শ্বাস ছাড়ে অরুণ, আজই প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। বললুম, ভিড় ছেড়ে একটু নির্জনে চলল। বলল, না। বললুম, একটু ট্যাক্সিতে ঘুরে বেড়াই চলল। বলল, না। জিজ্ঞেস করলুম, রাত্রে একা একা

লাগে না? ভীষণ রেগে গেল—বলতে বলতে অরুণ হেঁচকি তুলে হেসে উঠল, আসলে মেয়েটা একেবারে বাচ্চা, আর নতুন। তার ওপর বোধ হয় এনগেজড। তবু আমি অম্বিকা হালদারের জামাই, আমাকে এড়াতে পারে না বলে এসেছিল বলতে বলতে সামান্য অহঙ্কারী হয়ে গেল অরুণের মুখ-চোখ! হেসে বলল, দূর শালা, এর চেয়ে মিস দত্ত অনেক হট ছিল। কী বাটক মাইরি...

আস্তে আস্তে উঠে মেঝেতে নিজের বমির ওপর দাঁড়াল অরুণ। বলল, শ্যাম, আমার দিব্যি মাইরি, বুড়ো যদি জানতে পারে...তোর শালা চোখ বটে! কী করে খুঁজে খুঁজে ওই রেস্তরাঁয় বের করলি আমাকে? নাকি শালা তুই সারাদিন আমার পিছনে লেগেছিলি! অ্যাঁ?

শ্যাম চুপচাপ চেয়ে থাকে। না, তাকে আর কিছুই করতে হবে না। সে বুঝে যায় অরুণকে কষ্ট দেওয়ার ভার অরুণই নিয়েছে।

অরুণ তার বমির ওপর একবার পা হড়কায়, সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে দরজার কাছে চলে যায়। হাত তোলে। হেসে বলে,টু অ্যামেরিকা...! চলে যায়। দরজা পর্যন্ত মেঝেতে তার বমিতে ভেজা পায়ের ছাপ পড়ে থাকে।

শ্যাম জানালা দিয়ে দেখে অরুণ রাস্তার ধারে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একখানা হাত শূন্যে তুলে অদৃশ্য ট্যাক্সি থামানোর চেষ্টা করছে।

সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। অরুণ ঠিক পৌঁছে যাবে-শ্যাম জানে। কাল সকালে আজকের কথা মনে থাকবে না অরুণের। প্রতিদিনই ওইভাবে আগের দিনের কথা ভুলে যেতে যেতে ঠিকঠাক মতোই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যাবে অরুণ। ঘরের মেঝের দিকে চেয়ে অর্থহীন হাসল শ্যাম।

অনেক দিন পর তার ইচ্ছে করল ঘরটাকে একটু সাজায়।

১৩. আজকের কাগজে খবরটা আছে

হ্যাঁ। আজকের কাগজে খবরটা আছে। ঠিক বোঝা যায় না, তবু বোধহয় এটাই সেই খবর।

প্রথমে কিছুক্ষণ নিজের চোখ, বোধশক্তি এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বিশ্বাস হয় না শ্যামের। তারপর আস্তে আস্তে সে বুঝতে পারে ঘটনাটা বোধহয় ঘটে গেছে। সত্যিই। কিছুকাল আগে দক্ষিণ কলকাতায় এক মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত শ্রীগৌর ভৌমিক (৩২) গতকাল দুপুরবেলা শুকলাল কারনানি হাসপাতালে মারা গেছে। দুর্ঘটনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জ্ঞান ছিল না। মৃত্যুর দু'বছর আগে তার বিয়ে হয়েছিল এবং তার একটি শিশুকন্যা আছে। আছে বাবা মা এবং তিন ভাইবোন। লোকটা খুব অখ্যাত ছিল না, রেডিয়োতে গান গাইত এবং তার দুটি রেকর্ডও আছে। যদিও গান শোনেনি শ্যাম, এবং লোকটার নামও তার জানা ছিল না।

এই সেই লোক কি না কে জানে! শ্যাম জানে না। আস্তে আস্তে খবরের কাগজটা সে মাটিতে রেখে দিল। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সে একটা সিগারেট ধরায়। আজও সেই রকম রোদ, অবিকল তেইশে ডিসেম্বরের মতো। ওই সেই রাস্তার তে-মাথার বাঁক। লোকটা ডান দিকে মোড় ঘুরতে গিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় আছড়ে পড়েছিল। গৌর ভৌমিক! গান গাইত! একটি শিশু মেয়ে আছে তার। আছে বউ! আছে বাবা মা ভাইবোন! আশ্চর্য, এত সম্পর্কের মধ্যে বাঁধা ছিল লোকটা! অথচ শ্যাম টেরও পায়নি। সে শুধু দেখেছিল একটা মোটরসাইকেলের কালো ভোতা মুখ, আর অচেনা একটা মানুষের ছুটন্ত শরীর। কে জানত যে লোকটার অত পরিচয় আছে!

তবু এই সেই লোক কি না কে জানে! শ্যাম জানে না। যদি এই সেই লোক হয়ে থাকে তবে শ্যাম এ-জন্মের মতো বেঁচে গেল। কোনও দিনই অকারণে আয়নার আলো ফেলার জন্য কেউ তাকে দায়ি করবে না। সমস্ত প্রমাণ লোপ পেল, গোপন রইল কারণ। শুধু জানা গেল যে লোকটা মারা গেছে।

অনেক দিন হয় আর আয়না দেখেনি শ্যাম। তাকের ওপর থেকে আয়নাটা তুলে নিতে গিয়ে দেখল অনেক ধুলো জমে আছে। নিজের আবছা অলীক এক মুখচ্ছবির দিকে সে একটু তাকিয়ে রইল। বলল, আমি নই। তারপর মাথা নেড়ে নিজের প্রতিচ্ছবিকে বলল, তুমি! তুমি করেছিলে! তারপর হাসল শ্যাম।

না। তোমাকে চিনি না। শ্যাম বলল।

ময়লা এন্ডির চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিল শ্যাম। সাবধানে তালা দিল ঘরে। ধীর পায়ে বেরিয়ে এল।

এসে বসল সেই ছোট্ট নির্জন চায়ের দোকানটায়। এক কাপ চা নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ, সিগারেট ধরাল। তারপর হঠাৎ খেয়াল হতে সে বাচ্চা বয়টাকে ডেকে আর-এক কাপ চা দিতে বলল। চা দিয়ে গেলে সে চায়ের কাপটা উলটো দিকের শূন্য চেয়ারের সামনে টেবিলের ওপর রাখে, ছাইদানিটা বসায় চায়ের কাপটার পাশে, একটা সিগারেট ধরিয়ে যত্নে রাখে ছাইদানিটার ওপর। বাচ্চা বয়টা চোখ গোল করে এই দৃশ্য দেখে, দোকানের বুড়ো মালিক তাকে লক্ষ করে, দুটি ছোকরা খদ্দের কথা থামিয়ে চেয়ে থাকে। শ্যাম লক্ষও করে না তাদের। শূন্য চেয়ারটার সামনে টেবিলের ওপর নিঃশব্দে পুড়তে থাকে একটি আস্ত সিগারেট, ধোঁয়া উঠে উঠে ঠান্ডা হয়ে আসে এক কাপ চা। মনে মনে নত হয়ে কথা বলে শ্যাম, গৌর ভৌমিক, যদি পারো তবে আবার জন্ম নিয়ো। আমি জানি, আবার জন্ম নেওয়া বড় সহজ হবে না। শূন্য থেকে, জল থেকে, বাতাস থেকে, মাটি থেকে আবার নিজের শরীর সংগ্রহ করে আনা, এবং তারপরও আবার ভুল, কেবল ভুল জীবন যাপন করে যাওয়া...তবু বড় ইচ্ছে হয়। আর-একবার, আরও একব্বার পৃথিবীতে জন্ম নিতে...গৌর ভৌমিক হয় না! যদি পারো আরও-একবার জন্ম নিয়ো, ততদিনে আমি পৃথিবীকে সুন্দর করে দেব, তুমি নিরাপদে পেরিয়ে যাবে, রাস্তার প্রতিটি বাঁক ঝড়ের বেগে পার হবে...লীলার কোলে শিশু হয়ে এসসা, আমি যত্নে তোমাকে বড় করে তুলব...

তারপর সে ওঠে। দুকাপ চায়ের দাম দিয়ে দেয়। বেরিয়ে পড়ে। তুমি ছেলে ছিলে, তুমি স্বামী ছিলে, তুমি ছিলে বাবা। তুমি এত কিছু ছিলে কেউ জানতই না। আবার দেখো, তুমিই উড়ন্ত মোটরসাইকেলে ছুটে যাওয়া এক বিচ্ছিন্ন মানুষ। তুমি পৃথিবীর কেউ না।...গৌর ভৌমিক, আমার ওপরওয়ালা বাস্টার্ড বলে গাল না দিলে আমি কি চাকরি ছাড়তুম? চাকরি না ছাড়লে আমি খেলার ছলে তোমার মুখে ফেলতুম আয়নার আলো? দেখো, এ-সবকিছুই একটি রহস্যময় কার্যকারণসূত্রে বাঁধা। তুমি কাকে দায়ি করবে? এই দুহাত শূন্যে তুলে ধরে বলছি আমি দায়ি নই। আবার দেখো মাথা নিচু করে আমিই স্বীকার করছি, আমি দায়ি। তুমি কাকে দায়ি করবে? মাঝে মাঝে রাতে ঘুমের ঘোরে আমি ডাক দিয়ে উঠি, শ্যাম! আবার নিজেই উত্তর দিই, যাই। নিজের সঙ্গে সব বোঝাপড়া আমার শেষ হয়নি। এখনও আমার ভিতরে রয়েছে একজন অচেনা শ্যাম।...না, পৃথিবী এখনও তেমন সুন্দর নয়, তবু আমি অপেক্ষায়

আছি...জন্ম নাও, আর-একবার জন্ম নাও, আমাদের কাছে এসো...

অনেকক্ষণ ধরে ধীরে হেঁটে হেঁটে বিচিত্র সব রাস্তার ভিতর দিয়ে চলে গেল শ্যাম। কখনও মাথার ভিতরে, কখনও বুকের ভিতরে ভ্রমরের গুনগুন শব্দের মধ্যে গভীর থেকে গভীরে চলে গেল একটি মোটর-সাইকেলের শব্দ। মাঝে মাঝে চমকে উঠল শ্যাম। নিজেকে ডেকে বলল, তুমিও...তুমিও উড়ন্ত মোটর-সাইকেলে ছুটে যাওয়া এক বিচ্ছিন্ন মানুষ। তুমি পৃথিবীর কেউ না...

না, তা নয়। শ্যাম জানে। সে শ্যাম চক্রবর্তী, বাবা কমলাক্ষ চক্রবর্তী, বিক্রমপুরের বানিখাড়া গ্রামে তার দেশ, সে ছিল সেইন্ট অ্যান্ড মিলারের ছোটসাহেব। এ-সব কিছুর মধ্যে সে বাঁধা আছে। অথচ সে জানে না সে কে! কিংবা সে কীরকম!

১৪. তালু শুকনো

তালু শুকনো। অল্প একটু মাথা ধরা আর সামান্য পিপাসা টের পাচ্ছিল শ্যাম। তার জ্বর আসছে। দুপুরে স্নান করার সময় তার গা শিরশির করছিল। তবু তার মনে হয়েছিল যে যথেষ্ট ঠান্ডা হচ্ছে না তার গা। শরীরেও অনেক ময়লা জমে আছে। তোয়ালে ঘষে সারা শরীরের ময়লা তোলার চেষ্টা করেছিল সে, তারপর অনেক জল ঢেলেছিল। তেল-না-দেওয়া রুক্ষ শরীর শীতে ফেটে-ফুটে গেছে, সেইসব ফাটা জায়গায় ঠান্ডা জল ঢুকে রি-রি করে কাঁপছিল সে। কান কনকন করে উঠল, ঠান্ডায় মাথা ধরে গেল, দাঁত ব্যথা করে উঠল। তবুও সে অনেক, অনেকক্ষণ ধরে স্নান করেছিল আজ। তারপর ময়লা এন্ডির চাদরটা গায়ে দিয়ে যখন সে হোটেলে বেরোচ্ছিল তখন থিরথির করে তার শরীর কাঁপছে, চোখে জ্বালাজ্বালা ভাব এবং মনে সন্দেহ যে শরীর যথেষ্ট পরিষ্কার হয়নি। এখনও ময়লা রয়ে গেছে। আরও অনেকবার অনেকক্ষণ ধরে তার স্নান করা দরকার।

ভাতের প্রথম গ্রাস মুখে তুলেই সে টের পেল ঘূর্ণি ঝড়ের মতো শবীবের ভিতর থেকে বমি উলটে আসছে। টেবিলে ভর রেখে চিনেমাটির প্লেটের ওপর সে মুখ নিচু করে রইল অনেকক্ষণ। তার মুখ থেকে বেয়ে লালা নেমে যাচ্ছিল প্লেটের ওপর। কেউ দেখে ফেলার আগেই সে রুমালে ঢেকে নিল মুখ। তারপর মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল। অস্পষ্ট গলায় আধঘুমন্ত ম্যানেজারকে বলল, খাবারটা কুকুরকে দিয়ে দেবেন।

কী হল?

শরীর ভাল নেই।

বেরিয়ে এসে পানের দোকান থেকে নুন, মশলা আর লেবুর রস দেওয়া একটা সোডা খেল সে, আর দুটো মাথা ধরার বড়ি। জিভে কোনও স্বাদ নেই। তার জ্বর আসছে। হয়তো খুব অসুখ হবে তার। অনেক দিন সে তাৰ শবীরের যত্ন নেয়নি, অনেক দিন ভাল করে

লক্ষ করেনি নিজেকে। তাকে অন্যমনস্ক রেখে অনেক দিন ধরে তার শরীর অসুখ তৈরি করেছে। কে জানে, হয়তো এবার বহুকাল তাকে শুয়ে থাকতে হবে ঘরে কিংবা হাসপাতালে।

ধীরে ধীরে হাঁটছিল শ্যাম। অকারণে তার কেবল মনে হচ্ছিল, অসুখটা এসে পড়ার আগে কোনও একটা কাজ তার শেষ করার আছে। শরীর কাঁপছে তার। মনের ভিতরেও একটা তাড়াহুড়োর ভাব, যেন বৃষ্টি আসছে তার আগেই উঠোন থেকে তুলে আনতে হবে রোদে দেওয়া কাপড়চোপড় কিংবা ডালের বড়ি। কিংবা ট্রেন ছাড়ার ঘন্টি বাজছে, সময় নেই, ছাড়ার আগেই তাই বিদায় দিতে আসা মানুষকে কয়েকটা জরুরি কথা বলে যাওয়া দরকার। আমার ঘরদোর সামলে রেখো, আমার পোষা পাখিকে দিয়ো দানা আর জল, দেখো যেন চুরি না হয়, আমি ফিরে আসার আগেই যেন বিদায় না নেয় আমার কোনও প্রিয়জন, আমার সুন্দর বাগানে যেন না ঢোকে গোরু-ছাগল, আমার নিজের হাতে লাগানো গাছগুলি যেন উড়ে না যায় বৈশাখের ঝড়ে।

এইসব অর্থহীন কথা সে বিড় বিড় করে বলছিল। ঠিক জানে না শ্যাম, কিন্তু কেবলই মনে হয় ও-রকমই জরুরি কিছু কথা কাউকে তার বলে নেওয়ার আছে। কাকে! ভেবেও পেল না শ্যাম। তার চারপাশে বেলুনের মতো শুন্যে মানুষেরা হাঁটছে–তার নিতান্তই অপরিচিত এইসব মানুষ। এদের কাউকে কি?

না। মাথা নাড়ে শ্যাম। না।

শেষ দুপুরে যখন রোদে পাকা ধানের মতো রং ধরেছে তখন সে এসে তার চেনা থামটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কাচের দরজাটার মুখোমুখি। আস্তে আস্তে হাঁফাতে লাগল। চেয়ে দেখল হঠাৎ বড় ঘোলাটে হয়ে গেছে কাচ, ভিতরটা প্রায় দেখাই যায় না। বিরক্ত হল শ্যাম—এরা কাজে বড় ফাঁকি দেয়, কাচের পাল্লাটা বোজ ধোয়া-মোছা করা উচিত। তার ইচ্ছে করছিল, ভিতরে গিয়ে কথাটা ওপরওয়ালাদের বলে আসে, আপনাদের কাচের দরজাটা নোংরা হয়ে আছে। ওটাকে পরিষ্কার করে দিন।

কিন্তু শ্যাম নড়ল না। দাঁড়িয়ে রইল। সে তার সমস্ত মন এবং হৃদয় দিয়ে কাচের সেই অস্বচ্ছতা ভেদ করার চেষ্টা করছিল।

চারদিকে ছায়ার মতো অলীক লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। কেউ টেরও পাচ্ছে না তাদের চেনা এই চতুর্দিক রাস্তাঘাট বাড়িঘর ভেদ করে একে একে হেঁটে আসছে মায়াবী হরিণেরা। তাদের মৃদু খুরের শব্দ বেজে যাচ্ছে। আর মেঘ ডেকে উঠছে শরীরের ভিতরে, বৃষ্টি নামছে, সেই বৃষ্টির জলের মতো ভালবাসায় টলটল করে ভরে আসছে বুক, বহু দূরে অচেনা এক রেল পুল পেরিয়ে যাচ্ছে কালো একটা রেলগাড়ি।

স্পষ্ট দেখতে পায় না শ্যাম, তার কেবল মনে হয় ভিড় থেকে খুব লম্বা কালো চেহারার একটা লোক বেরিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল। বড় নিষ্ঠুর তার মুখ, বড় দয়াহীন। সামান্য চমকে ওঠে শ্যাম মিনু না!

লোকটা স্থির চোখে দেখে তাকে। তার ঠোঁট নড়ছে, কথা বলছে সে। স্পষ্ট বুঝতে পারে না শ্যাম, তার মনে হয় মিনু তাকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি কে? কী চাও?

আমি! শ্যাম প্রাণপণে বলে, মিনু! আমি শ্যাম! শ্যাম চক্রবর্তী, বানিখাড়া গ্রামের কমলাক্ষ চক্রবর্তী আমার বাবা...আর তুই মিনু, নারায়ণগঞ্জের মিনু...না?

কাচের দরজাটা আড়াল করে লোকটা দাঁড়ায়। প্রকাণ্ড দেখায় তার চেহারা, তার ঠোঁট আবার নড়ে উঠল। শ্যাম বুঝল মিনু বলছে, তোমাকে চিনি না। পরমুহূর্তেই ঝলসে উঠল লোকটার ডান হাত, শ্যাম দেখল সেই হাতে উকোর মতো দেখতে একটা লোহার পাঞ্চ। বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এল সেই হাতখানা। অসহায় শ্যাম তা আটকাবার কোনও চেষ্টাই করল না। কোথায় তার লাগল তা বুঝতে পারল না সে। শুধু টের পায় মসৃণ থামের গা বেয়ে তার অবশ শরীর ফুটপাথে নেমে যাচ্ছে। তারপর আবার সে উঠে বসবার চেষ্টা করে, দেখতে পায় দু'খানা খুঁটির মতো পায়ে লোকটা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে উঠতেই হকি বুটের একটা লাথি এসে বসে গেল তার পেটে। পলকে সমস্ত শরীর থেকে বমি

উলটে এল, কলকল করে তার বিস্বাদ জিভ অতিক্রম করে টক-তেতো জলের ধারা নামল। ভিজে গেল বুক। অদ্ভুত হালকা লাগল তার বুক–অনেক দিন ধরে এই বমিটা তার ভিতরে জমে ছিল। আবার উঠবার চেষ্টা করে শ্যাম। কিন্তু তাকে আর উঠতে হয় না। লোকটা বাঁ হাত বাড়িয়ে গলার কাছে তার চাদরটা মুঠো করে ধরে, তারপর টেনে তুলে তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়। আবার ঝলসে ওঠে তার ডান হাত, হাতে উকোর মতো দেখতে সেই পাঞ্চ। হাতখানা ছুটে আসে। মৃদু হাসে শ্যাম। বাধা দেয় না। ঘুষির জোরে টলে ওঠে তার মাথা, ঝনন করে ঠুকে যায় পিছনের থামে। আশ্চর্য! শ্যামের বড় ভাল লাগল। টলে পড়তে পড়তে সে লোকটার চাদররা-হাতে আটকে থেকে বিড়বিড় করে, কেন মারছিস মিনু? কেন মারছিস! আমি এখানে এসে লীলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি বলে? নাকি অনেক দিন আগে আমি একজনের মুখে আয়নার আলো ফেলেছিলুম বলে?...আঃ, যে কারণেই হোক...থামিস না মিনু...সাবাস!

সে শুনতে পায় মিনু বলছে, শুয়োরের বাচ্চা, বেজন্মা.... .

না। মাথা নাড়ে শ্যাম। আমি শ্যাম চক্রবর্তী, কমলাক্ষ চক্রবর্তী আমার বাবা, বিক্রমপুরে বানিখাড়া গ্রামে আমার দেশ...

সে দেখতে পায় পানা পুকুর, ঘাটে যাওয়ার পথ, কামরাঙা গাছ আর কুয়োপাড়ের আতাবনে চকচক করছে জোনাকি পোকা, আর প্রকাণ্ড এক অন্ধকারের মধ্যে দাওয়ায় ছোট্ট একটু হ্যারিকেনের আলো করে বসে মা হঠাৎ বীজমন্ত্র ভুলে গিয়ে মৃদু স্বরে ডাকছে, মনু...মনু রে... অ মনু...মনু।...

চারদিক থেকে ছুটে আসছে লোক। লম্বা কালো চেহারার মিনু আঙুল তুলে তাকে শাসাল। ঠিক বুঝতে পারল না শ্যাম, মিনু কী বলছে, তবু সে মাথা নেড়ে বলবার চেষ্টা করল, ঠিক আছে। সব ঠিক আছে।

মিনু কাউকে কোনও জবাবদিহি করল না, নীরবে শেষবার শ্যামকে দেখে নিয়ে ভিড় ঠেলে গটগট করে বেরিয়ে গেল।

আবার আস্তে আস্তে মিনুর হাত থেকে ছাড়া-পাওয়া তার শরীর মাটির দিকে নেমে যাচ্ছিল। কেন মিনু তাকে মারল তা বুঝল না শ্যাম। বুঝবার দরকারও ছিল না। শরীর ভরে আসছে জ্বর, সে কোনও ব্যথা-বেদনা টের পায় না, তার কেবল ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। চেয়ে দেখে, অচেনা অলীক ছায়ার মতো মানুষেরা তাকে ঘিরে জড়ো হচ্ছে। সে বিড় বিড় করে বলে, সরে যাও, ওই কাচের দরজাটা আড়াল কোরো না।

আশ্চর্য! ভিড় ভেদ করে সে কাচের দরজাটা দেখতে পায়। ছায়ার মতো লীলা এসে কাচের গায়ে মুখ রেখে দাঁড়িয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পারে শ্যাম, লীলা আজ তার অপেক্ষায় ছিল। শ্যামের প্রিয় ছিল বাসন্তী রং। সেই রঙেরই শাড়ি পরেছে লীলা, শান্ত বিষণ্ণ তার চোখ, সমস্ত শরীরে মা হওয়ার আগের নতা ফুটে আছে। চাপা কান্নায় লীলার ঠোঁট কাঁপছে কেন, এত নিষ্ঠুর কেন তোমরা! ও লোকটা আমার কোনও ক্ষতি করেনি কোনও দিন...

হঠাৎ আবার শ্যামের বুকের মধ্যে গুর গুর করে মেঘ ডেকে ওঠে, চমকে ছুটতে থাকে হরিণের পাল...তারপর কেবল হরিণ আর হরিণ, সরল ও সুন্দর চোখের হরিণেরা ছুটে আসে দিগ্বিদিক জুড়ে...মেঘের দুপুরে অচেনা এক রেল পুল পার হতে থাকে কালো রেলগাড়ি...বৃষ্টির জলে ভরে ওঠে বুক...

অস্বচ্ছ চোখে ভিড়ের মধ্যে এক-আধটা চেনা মুখ খুঁজে বেড়ায় শ্যাম—আঃ সোনাকাকা! রাঙ্গাপিসি। মানুমামা! আমি মনু, আমি তোমাদের মনু...জন্ম নেওয়া বড় কষ্টকর, তবু তোমাদের জন্যই এই দেখো আমি আর-একবার জন্ম নিচ্ছি...ভালবাসা যে কত কষ্টের তা জানে তামার মা, তবু আমি সেই কষ্ট বুকে করে নিলুম...শিগগিরই আমি সুসময় নিয়ে আসছি পৃথিবীতে...অপেক্ষা করো...

বড় মায়ায়, বড় ভালবাসায় ধুলোমাটির মধ্যে মুখ গুঁজে দেয় শ্যাম।